প্রবন্ধ

তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা

গত ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' সুলেখক হেমেন্দ্রবাবুর 'সঞ্চয়ে' 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে বোধ হয় অনেকেই ক্ষুণ্ন হয়েছেন। ততোধিক মর্মাহত হয়েছেন বোধ হয় আমাদের নতুন কবিভায়ারা। লেখাটা যে তাঁদের নাকের ডগায় মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো আবির্ভূত হয়ে তাণ্ডব নৃত্য করে গেছে! সেই 'মান্ধাতার আমলের পুরানো' এক মহাকবি-প্রসিদ্ধিতে এমন একটা প্রচণ্ড লাঠ্যাঘাত, কী সাংঘাতিক কথা!

তবে ও সম্বন্ধে এ গরিবের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

প্রথম 'New York Herald' নামক আমেরিকান সংবাদপত্রের অচিন লেখকের তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিয়েই আমার ভয়ানক একটা খটকা বেধে গেছে। আজকাল অনেক লেখক ঘরে বসেই দুনিয়ার যে-কোনো স্থানের ভ্রমণ-কাহিনী অসংকোচে লিখে থাকেন; এ একটি নিষ্করুণ সত্যি কথা। তাঁরা হয় বিখ্যাত ভ্রমণকারীর কাছ থেকে শুনে নতুবা কোনো ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে এবং তাতে কিছু ঘরের তেল-মসলা সংযোগ করে আমাদের সামনে এনে হাজির করেন এবং আমরাও 'কৃতার্থ' হয়ে যাই। আমিও ঐ লেখা পড়েছি, তাতে তিনি যে তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তা কিছুতেই বোঝা যায় না। হতে পারে তিনি কিছুদিন বা খুব বেশিদিন সেখানে ছিলেন, কিন্তু তিনি—আমার যতদূর সম্ভব সাদা চোখে কিছুই দেখেননি। 'সাহেব' তুর্কদের সম্বন্ধে অন্যান্য যে-সব বাজে বকেছেন, সেসম্বন্ধে কিছু না-বলে আমি কেবল তুর্ক মহিলার সৌন্দর্য সম্বন্ধে দু'-চারটি কথা বলে এই নীরস গদ্যের অবসান করব।

পাশ্চাত্য প্রদেশে যে পৌরাণিক প্রবাদের মতো তুর্ক তরুণীর বিশ্ব-বিমোহিনী সৌন্দর্যের গুণকীর্তন হয়ে আসছে, আর শুধু পাশ্চাত্য প্রদেশ কেন, জগতের সমস্ত দেশের নূতন-পুরাতন সকল কবি ও লেখকই যে 'পঞ্চমুখে' তুর্ক রমণীর ভুবনে-অতুল সুষমার বর্ণনা করে যাচ্ছেন, সব কি তাহলে বিলকুল মিথ্যা? তবে কি তাঁরা কোনো কিছু না দেখে-শুনেই চক্ষু বুঁজে, শুধু কল্পনার নেশায় মনের চোখে বেচারি তুর্ক-তরুণীদের মূর্তি এঁকে তাদিগকে একেবারে হুরপরির সঙ্গে সমান আসন দিয়েছেন? এমন অনেক জগদ্বিখ্যাত কবি ও লেখক তুর্ক মহিলার রূপ বর্ণনা করতে করতে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন, যাঁরা দস্তুরমতো তুর্ক দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, তাঁরা যে নেহাৎ কবিত্বপূর্ণ মোলায়েম ধরনে চক্ষু বুঁজে বেড়িয়ে বেড়াননি, এ বোধ হয় বিশ্বাস করা যেতে পারে। তাছাড়া তুর্কদের দেশ পাশ্চাত্য দেশেরই অন্তর্গত, আর তা নেহায়েত দূরও নয়, অথচ বাবা আদমের কাল হতে আজ পর্যন্ত তুর্ক রমণীদের মুখচন্দ্র কেউ দেখেননি? এবং খামাখা ঘরের খেয়ে বেচারিদের রূপ বর্ণনায় মুখে ফেনা উঠিয়েছেন? আর ঐ আমেরিকান

লেখক মহাশয় একজন 'হাম্বা চোম্বা' অবতারের মতো সটান তুর্কস্থানে অবতীর্ণ হয়ে সারা দুনিয়ার চোখের উপরকার একটা মস্ত পর্দা ফাঁক করে ধরলেন? লেখকের 'কেরদানি'কে বাহাদুরি দিতে হয় কিন্তু। আর হেমেন্দ্রবাবুও সানাইয়ের পোঁ ধরার মতো তাঁর দগ্ধ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছেন যে হুরপরি দেখা আর তাঁর ভাগ্যে ঘটল না। তাই দুধের সাধ ঘোলে মিটানোর মতো গানে-গল্পে-কবিতায় প্রসিদ্ধা হুরপরি নামে আখ্যাতা তুর্ক রমণীর রূপ-মাধুর্য শুনেই কোনো রকমে নিজের 'আকুল পিয়াসা' দমন করে রেখেছিলেন,—এমন সময় 'দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠের' মতো সশরীরে আমেরিকান লেখক মশায় মৃত্তিকা ভেদ করে উঠে একেবারে 'চিচিং ফাঁক' করে দিলেন বা মাঝ মাঠে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন। আসল তুর্ক রমণীরা (দো-আঁশলা নয় অবশ্য।) বাস্তবিকই হুরপরির চেয়েও সুন্দরী। ও বিষয়ে আমার মতো অধমাধমের অদৃষ্ট দগ্ধ না হয়ে খুব স্নিগ্ধই বলতে হবে, কারণ আমি আমার এই চর্মচক্ষে বাস্তব জগতে যে কয়জন তুর্ক রমণীকে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তার অন্তত একজন এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টকে বাংলার স্টেজে হাজির করতে পারলে অনেকেরই 'মূর্ছা ও পতন' হতো এবং মাথা খারাপ হয়ে যেত, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।-দুনিয়ার সকল জাতির রমণীই (বিশেষত যাঁরা সৌন্দর্যের জন্য বিশ্ব-বিশ্রুত, উদাহরণস্বরূপ—পার্শি, ইরানি, ইহুদি, আরবি প্রভৃতি) দু-দশজন করে আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে দেখবার সুযোগ পেয়েছি এবং তা স্বপ্নে নয়, দিবালোকে, কল্পনায় নয় বহাল খোশ-তবিয়তে, আর প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফারিত করে। কিন্তু কই তুর্ক মহিলার মতো এমন ভুবন-ভুলানো রূপ, অতুলনীয় সৌন্দর্য তো আর পোড়া চোখে পড়ল না। তবে হতে পারে, হয়তো ঐ তরুণীদের রূপাগ্নি আমার চোখ ঝলসে দিয়েছে, তাই আর দুনিয়ার কোথাও সুন্দরী দেখতে পাই না।

হেমেন্দ্রবাবু পরের মুখে ঝাল খেয়ে একেবারে লম্ফঝম্প দিয়ে বলে ফেলেছেন, 'তুর্ক রমণীরা মোটেই সুন্দরী নয়।' কেননা একজন সাহেব বলেছেন যখন, তখন তা বেদবাক্য। একটু রসিকতার লোভে তাঁর মতো লোকের পক্ষে একজন খামখেয়ালি লেখকের ছেঁদো কথায় সায় দেওয়া উচিত ছিল না। সাহেবের সুরারাগরঞ্জিত নয়নে ওঁদেরই স্বজাতির মতো 'ওল ছিলা' চেহারা হলেই বোধ হয় বেশ সুন্দরীটি হতো। তবে এর সর্বশেষ প্রমাণ পেতে হলে আমাদের দুইজনকেই আবার 'আস্তানা' পর্যন্ত ছুটতে হয়, সেও তো এক সাংঘাতিক ব্যাপার। হেমেন্দ্রবাবু ইচ্ছা করলে অন্তত সিরাজী সাহেবের কাছেও এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানতে পারতেন।

পিকিং হতে আমদানি বেঢপ মুখ, হাবশির দেশ হতে রপ্তানি বিটকেল কুচকুচে মুখ, 'লিভান্টিয়ান', 'সার্কোসিয়ান' বা 'স্কান্ডিনেভিয়ান' দেশের চ্যাপ্টা বেখাপপা মুখ ইত্যাদি যেসব পাঁচমিশেলি মুখ সাহেব-পুঙ্গব তুর্কিদের মাঝে দেখেছেন, তাই নিয়ে যদি তুর্ক তরুণীর সুষমা সম্বন্ধে ঐরকম বীভৎস মত পোষণ করেন, তাহলে আমাদের বলবার কিছুই নাই। তাহলে সাহেবেরই জয়! তাছাড়া লেখক জানেন এবং স্বীকারও করেছেন, 'তুর্কিরা নানা দেশ হতে নানা জাতের বন্দিনী জোগাড় করে আনত, আর তাদেরই সঙ্গে

অবাধ রক্ত-মিশ্রণের ফলে এই অসংখ্য ও বিচিত্র মুখাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে।' অতএব সকলেই পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে শুধু এই গজদন্ত, রঙ-বেরঙের মুখ আদৌ তুর্কির নয়, ওসব হচ্ছে বাঁদিদের মিশ্র মুখ। ঐসব পাঁচমিশেলি মুখই বোধ হয় ঘোমটা খুলে বাইরে বেরিয়ে সাহেবের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে।

তুর্কিরা আধুনিক পাশ্চাত্য কায়দা-কানুনে কেতাদুরস্ত হলেও এখনও তাদের মেয়েরা পথে ঘোমটা খুলে বেরোয়নি, আর বেরুলেও এমন সাধারণ জায়গায় বেরোয়নি, যাতে তাদের ঐ স্বর্গীয় সুষমা-মাধুরী সাহেবের বিড়াল-নয়ন সার্থক করে দিয়েছিল। সম্ভ্রান্ত আসল তুর্কি মহিলারা হাজার শিক্ষিতা হলেও এখনও রীতিমতো বোরকা দিয়ে পথে বের হন। কাজেই অন্যান্য দেশের মতো 'ঘোমটার আড়ালে খেমটার নাচ' দেখা লেখকের আর পোড়া কপালে জোটেনি।

এইসব খামখেয়ালি লেখকের কাণ্ড দেখে আমি নির্ভয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, সেই সাহেব যদি বাংলায় আসেন, তাহলে দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার নমুনা স্বরূপ আমাদের কুললক্ষ্মীদের রূপ বর্ণনা নিম্নলিখিতরূপে করবেন—

"বাঙালি মেয়েগুলো বিশ্রী কালো, তদুপরি তৈলচিক্কণ হওয়ায় বোধ হয় যেন আবলুস কাঠে ফ্রেঞ্চ পালিশ বুলানো হয়েছে। এই জাতীয় স্ত্রীলোক পাড়াগাঁয়ে থাকে। (বাগদিদের মেয়ে দেখে সাহেব আমাদের বনফুলের মতো সুন্দরী কুলবধূদের সম্বন্ধে এই রকম সাংঘাতিক ধারণায় উপনীত হবেন।) তারপর শহুরে তাবৎ স্ত্রীলোকই খুব বেশি রকমের স্থূলাঙ্গিনী, দেহের অনুপাতে উদর ঢক্কা-সম ভীষণ প্রশস্ত, পরিধানে কম-সে-কম দুই তিন থান কাপড়, অঙ্গে খুব ভারি ভারি অলঙ্কার, মুখটি চন্দ্রের মতো নয়ই—তবে অনেকটা মালসার মতো।' মাড়োয়ারি মেয়েদের দেখে একথাই লিখবে সাহেব, কারণ তারাই বেশির ভাগ বাইরে বেরিয়ে রাস্তার ধুলো উড়োতে উড়োতে কাঁইয়ো মাইয়ো করে যায়। সাহেবের এ বর্ণনা ডাহা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না, আর তাই পড়ে আমাদের সুন্দরী তরুণীরা হাত-পা কামড়িয়ে মরবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যদি কখনও আমার নসিবে হুরপরি দেখা থাকে তবে তারা কখনও তুর্কি যুবতীর চেয়ে সুন্দরী হবেন না, এ-বিষয়ে আমি স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে বসে আছি। এমন ডাঁশা আঙুর আর পাকা ডালিমের মতো মিশানো লাবণ্য, আর আয়নার মতো স্বচ্ছ তরল সৌন্দর্য বোধ হয় বেহেস্তেও দুষ্প্রাপ্য। রমণী বিশ্বে সৌন্দর্যের সার যে কত বেশি সুন্দরী হতে পারে, তা তুর্কি তরুণী না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। আমি যদি কবি হতুম, তাহলে আমিও আমার সোনার বীণার তারে ঘা দিয়ে আকুল কণ্ঠে গেয়ে উঠতাম—

আগার ফেরদৌস বর রুয়ে জামিন আস্ত।
হামিনাস্ত-ও হামিনাস্ত-ও হামিনাস্ত॥

জননীদের প্রতি

[ছেলেমেয়েদের হাঁটানো]

খোকা-খুকিদের হাঁটতে দেখা বাপ-মায়ের বড্ডো বেশি আনন্দদায়ক। তাই তাঁরা যত শিগগির পারেন খোকা-খুকিদের হাঁটা শেখাবার জন্যে যেন উঠে-পড়ে লেগে যান; আমি অনেক ঘরে দেখেছি যে, ছেলের মা তার প্রতিভূ স্বরূপ অন্য দুটি ছেলের দ্বারা তাঁর খোকাকে হাঁটা শেখাবার ভার দিয়েছেন; আর ছেলে দুটিও খোকার দু ডানায় ধরে টেনে-হিঁচড়ে তাকে একরকম হাওয়ার মতোই বেগে চালাতে চেষ্টা করছে; শিশুর এতে ঘোর কষ্টকর আপত্তি থাকলেও তারা তা গ্রাহ্য না করে দস্তুরমতো নিজেদের কর্তব্য করে যায়। এ যেন ঠিক সেই কাহিনীর 'হালালজাদা-হারামজাদার' মতো আর কি? কিন্তু এ রকম 'ধরপাকড়কে আল্লাহু আকবর' এর ফল যে কত খারাপ, তাই বলছি। প্রথমেই তো স্বভাবের বিরুদ্ধে এরকম ধস্তাধস্তি করাই আমাদের জবর ভুল। কেননা, দেখবেন—যে-ই শিশুদের পায়ের মাংসপেশি ভর করে দাঁড়াবার বা চলবার মতো শক্ত হয়েছে, অমনি তারা নিজে নিজেই দাঁড়াতে এবং ক্রমে হাঁটতে চেষ্টা করবে। এ সময়ে বরং বেচারাদের একটু সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু বস্তুত এসবেরও কোনো দরকার নেই। প্রথমে শিশুরা আপনি কোনো জিনিস ধরে দাঁড়াবে, তারপর 'চলি চলি পা পা' করে বাঁকাভাবে একটির পর একটি পা ফেলবে। (এ চলা যেন অনেকটা পল্টনের সিপাহিদের স্লো মার্চের মতো।) ক্যাঁকড়ার মতো এ চলার বিকৃতি ক্রমে আপনি শুধরে যাবে। তবে ছেলের মাদের এইটুকু লক্ষ্য রাখা উচিত যে দুষ্টু ছেলে যেন পড়ে না যায় বা কোনো আঘাত না পায়। শিশুদের ভর করে দাঁড়াবার জন্যে আজকাল একরকম 'স্ট্যান্ড' বেরিয়েছে—দেখতে অনেকটা মাছধরা 'পলুই'-এর মতো। এই ক্ষুদ্র জীবগুলির পক্ষে তা খুব উপকারী আর দরকারি। কেননা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এরা ওর ভেতরে বেশ বাবুর মতো বসে আরাম করতেও পারে, আবার যখন ইচ্ছা হবে তখনই উঠে হাঁটতেও পারে। অনেক সময় বাপ-মায়ে বুঝতে পারে না ছেলে কখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আর এতেই শিশুদের সমূহ ক্ষতি হয়। অনেক ছেলে-মেয়ের পা ধনুর মতো বাঁকা হতে দেখেছি, আর এ হয় মা-বাপেরই দোষে। কারণ, ছেলে-মেয়ের হাঁটবার ক্ষমতা হবার আগেই তাঁরা জোর করে তাদের হাঁটাতে শেখাবেন। কী জুলুম! ধরুন, যদি শিশুদের পায়ের হাড় আর মাংশপেশি দেহের ভার সইবার মতো শক্ত না হয়, তাহলে তাদের জোর করে দাঁড় করাতে গেলে বা হাঁটাতে গেলে তাদের কচি হাড় বেঁকে যাবে না কি? স্নেহের এরকম জবরদস্তির গজবে পড়ে অনেক বেচারার পা জন্মের মতো ব্যাঁকা হয়ে যায়! এমন অনেক শিশু দেখা যায়, যাদের হাঁটতে সাধারণের চেয়ে একটু বেশি সময় লাগে। তাই বলে তাদিগে জলদি হাঁটা শেখাবার জন্যে যে কুস্তাকুস্তি করতে হবে, এর কোনো মানে নেই। যখন উপযুক্ত হবে, তখন সে আপনিই হাঁটবে। এসব তার প্রকৃতি-মায়ের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। কারণ, তার বড় সুদক্ষ ধাত্রী আর ছেলেদের নেই। আর যদি নিতান্তই কোনো শিশুর হাঁটতে বড্ডো বেশি দেরি লাগে, তাহলে কোনো

ভালো ডাক্তারকে দেখাবেন। কেননা খুব সম্ভব শিশুদের খাবারের মধ্যে মাংসপেশির আর হাড়ের শক্ত হওয়ার জন্যে যে রকম সারবান জিনিসের দরকার হয়তো আপনার বরাদ্দ খাবারে তা থাকে না। অতএব দু-তিন মাস দেরি হলে তাকে জোরজবরদস্তি করে হাঁটবার কোনো দরকার নেই। যখন জন্মেছে, তখন প্রকৃতি তাকে হাঁটাবেই। মনে রাখবেন, প্রকৃতি আপনাদের মাদের চেয়ে কম স্নেহময়ী নয়।

পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব

ঘোড়ার ভুরু হয় না। (তাই বলে কই তাকে তো বিশ্রী দেখায় না।)

রোমন্থনকারী জন্তু মাত্রেরই ক্ষুর বিভক্ত। (কিন্তু সাহিত্য-রোমন্থনকারী প্রাণিগুলির আদতে ক্ষুর হয় না। এটা বুঝি ব্যতিক্রম।)

তিমি মৎস্যের দাঁত হয় না। তবে হাড়ের মতো একরকম পাতলা স্থিতিস্থাপক (যা রবারের মতো টানলেই বাড়ে আবার আপনি সংকুচিত হয়) জিনিস তার ফোকলা মুখের উপর-চোয়ালে সমান্তরাল হয়ে লেগে থাকে। তাই দিয়ে এ মহাপ্রভুর দাঁতের কাজ চলে।

কচ্ছপ বা কাছিমের আবার দাঁত বিলকুল নদারদ (ছেলেবেলায় কিন্তু শুনেছি যে কাছিমে আর ব্যাংএ একবার কামড়ে ধরলে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না।)

শশক বা খরগোশের চোখ কখনও বন্ধ হয় না, কেননা বেচারিদের চোখের পাতাই নেই। মেমসাহেবদের মুখের বোরকার চেয়েও পাতলা একরকম চামড়ার পর্দা ঘুমোবার সময় তাদের চোখের উপর ঘনিয়ে আসে। (মানুষের যদি ওরকম হত, তাহলে তো লোকে তাকে 'চশমখোর', শা-র চোখের পর্দা নেই প্রভৃতি বলত ! তাছাড়া, চোখের পাতা না থাকলে প্রথমেই তো আমাদের চোখে ঘা হয়ে ফ্যাচকা-চোখো হয়ে যেতাম)।

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে হরিণের নাকি নাকের ছ্যাঁদা ছাড়া আরও কতকগুলি ঐরকম ছ্যাঁদা আছে। আশ্চর্য বটে !

প্যাঁচার চোখে কোনো গতি বা ভঙ্গি নেই, অর্থাৎ কিনা তাদের ঐ ভাঁটার মতো চোখ দুটির তারা নড়েও না চড়েও না। সদা-সর্বদাই ডাইনি মাগির মতো কটমট করে তাকায়।

ভেড়ার আবার উপর-চোয়ালে দাঁত হয় না। (তাহলে দেখা যাচ্ছে যাঁর ওপর-চোয়ালের দাঁত ভেঙে যায় তিনিও ঐ ভ্যাঁ-গোত্রের)।

উট তো একেই একটা বিদঘুটে জানোয়ার, যাকে দূর থেকে আসতে দেখে অনেক সময় একটা সচল দোতলা বাড়ি বলেই মনে হয়। কিন্তু এর চেয়েও ঐ কুঁচবগলার হস্তম সংস্করণ জীবটির একটা বিশেষ গুণ আছে। সে গুণ আবার পেছনকার পদদ্বয়ে। উষ্ট্র-ঠাকুর তাঁর পেছনের শ্রীচরণ দুটি দিয়ে তার বড় বপুর যে কোনো স্থান ছুঁতে পারেন।

একটি হাতির গর্দানে (স্কন্ধে) মাত্র চল্লিশ হাজার (বাপ্‌স্‌!) মাংসপেশি থাকে। সাধে কি আর এ-জন্তুর হাতি নাম রাখা হয়েছে।

কাঁকড়া এগিয়েও যেমন বেগে হাঁটতে পারে, পিছিয়েও তেমনি হাঁটতে পারে। বাহাদুরি আছে এ মস্তকহীন প্রাণীটির।

আপনারা কোনো সর্বদর্শী জানোয়ার দেখেছেন কি? সে হচ্ছে জিরাফ। এই জন্তুপ্রবর চর্তুমুখ না হয়েও আগেও যেমন দেখতে পান, পিছনেও তেমনি দেখতে পান। ভাগ্য আর কাকে বলে!

আর একটি মজার বিষয় হয়তো আপনারা কেউ লক্ষ্যই করেননি। বৃষ্টি হবার আগে বিড়াল জানতে পারে যে বৃষ্টি আসবে, আর সে তখন হাঁচে। অতএব বিড়াল বৃষ্টির দূত বললে কেউ আপত্তি করবেন না বোধ হয়।

উত্তর আমেরিকার ময়দানে একরকম লাল খেঁকশিয়ালি আছে। শুনছি, দুনিয়ার কোনো প্রাণীই নাকি তাদের সঙ্গে দৌড়ুতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশি খেঁকিও বোধ হয় কম যাবে না। দিব নাকি এই লাল খেঁকির সঙ্গে আমাদের দেশি খেঁকির একদিন 'ঘোড়-দৌড়' লাগিয়ে?

জীবন-বিজ্ঞান

[দুঃখ-কষ্টের মহত্ত্ব]

আগুন যেমন ধাতুকে পুড়িয়ে খাঁটি করে; দুঃখও তেমনি আত্মাকে একেবারে আয়নার মতো সাফ করে দেয়। কিন্তু তাই বলে মনের সব কষ্টই দুঃখ নামে অভিহিত হতে পারে না। মোটামুটি দেখতে গেলে দুঃখ দু রকমের। একটি হচ্ছে নিজের কষ্টের জন্য দুঃখ পাওয়া, অন্যটি হচ্ছে অন্যের কষ্টে দুঃখ অনুভব করা। এই দুই দুঃখই কষ্ট দেয়; কিন্তু তারা একরকমের নয়।

আমি হয়তো আমার প্রিয়তম জিনিসটাকে হারিয়েছি, কিংবা আমি যা চাই তা পাই না, এইরকম সবের জন্যে যে কষ্ট পাওয়া, সেই হচ্ছে নিজের জন্যে দুঃখ। এর ফল, আত্মাভিমান এবং আত্মসুখের বৃদ্ধি। অন্যের দুঃখ দেখে নিজের দুঃখ মনে পড়া আর তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া, ক্রমে নিজের কষ্টকে তুচ্ছ করে এই পরের কষ্টটাকে বড় করে দেখা, এইসব মহৎ অনুভবের ফল হচ্ছে আত্মার, প্রাণের প্রসারতা লাভ। একদিন এক বিধবা তার মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে গৌতম বুদ্ধের কাছে কেঁদে পড়ল যে তার ঐ একমাত্র মৃত পুত্রকে বাঁচিয়ে দিতে হবে। বুদ্ধদেব বললেন,—'দুঃখ নেই, শোক নেই—এমন কোনো ঘর হতে কয়েকটি বিল্বপত্র যদি এনে দিতে পারো তাহলে তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেবো।' বিধবা অনেক খুঁজেও দুঃখ-শোকের ছোঁয়া লাগেনি এমন কোনো ঘর দেখতে পেল না। তাই তিন দিন পরে যখন এই পুত্রহারা জননী ফিরে এল, তখন সে বিশ্বের দুঃখ-কষ্টের মাঝে নিজের দুঃখের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে, আর তার ঐ সসীম বুকেই অসীমের বীণের গুমরে-ওঠা বেদনার নিবিড় শান্তি

নেমে এসেছে। সে তখন আর নিজের সন্তানের জন্য দুঃখ করছে না; তার মাতৃস্নেহ সারা বিশ্বে তখন ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্যের দুঃখ-বেদনা অনুভব করাই হচ্ছে মহত্তর ব্যথার অনুভব। কেননা ব্যথার ব্যথীর এ ব্যথায় কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। তার কারণ, এ হচ্ছে সেই ব্যথা, যার অনুভব হয় নিজের বুকের বেদনা মনে পড়ে আত্মার ধর্ম এমনি বিস্ময়কর যে, এই পরের ব্যথায় ব্যথিত হওয়াতেও সে এমন একটি নিবিড় আনন্দের আভাস পায়, যেন রক্তমর্মর বুকে ঝর্নাধারার একটি স্নিগ্ধ দীঘল রেখা।

এ সেই দুঃখ যা পয়গম্বরগণ বিশ্বমানবের অন্তরে অন্তর মিশিয়ে অনুভব করেছিলেন। এর বেদনা—এর আনন্দ প্রকাশের ভাষা নেই। এ-ই হচ্ছে সেই সাধনা, যা মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। এই বেদনার গভীর আন্তরিকতাতেই ত্যাগের নির্বিকার প্রশান্তি, এই চির-ব্যথার বনেই আনন্দ-স্পর্শমণি খুঁজে পাওয়া যায়।

সকলেই এ অমৃতময় দুঃখ অনুভব করতে পারে না। মহত্তর আত্মা যাঁদের, ভুক্তভোগী যাঁরা, শুধু তাঁরাই এ হেঁয়ালির মর্ম বোঝেন। এ চায় কল্পনা আর মানব-মনের বিস্ময়কর বোধশক্তি। তাই এ পথের ভাগ্যবান পথিক তাঁরাই যাদের হাতে গভীর জ্ঞান আর উঁচু প্রাণের পাথেয় আছে।

অনেক রকমের দুঃখ-কষ্ট আমাদের ঘিরে রয়েছে এবং তার অনেকগুলিরই প্রতিকার অসম্ভব। যখন আমরা আপন বুকের বেদন দিয়ে সারা বিশ্বের ব্যথা নিজের করে নিতে পারি, কেবল তখনই আমাদের আত্মা উন্নত প্রসারিত হয়। তখনই আমরা সত্যকে চিনি, সুন্দরকে উপলব্ধি করি—আর তাই তখন আমাদের আনন্দ ত্যাগে, পরের জন্যে কেঁদে, বিশ্বের ব্যথিতের জন্য জান কোরবান করে।*

আমার ধর্ম

দেশে একটা কথা উঠেছে যে, মুক্তির জন্য যে আন্দোলন আমরা চালাচ্ছি আমাদের তা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে। দেশে যখন মুক্তির জন্যে ভাঙ ভাঙ বলে রব করে লাখ লাখ লোক আগল ভেঙে বেরিয়ে এল, তখন তারা এক নতুনভাবে মাতোয়ারা হয়ে মানুষের মতো মানুষ দেখে তার পেছনে পেছনে চলতে লাগল। কিন্তু আজ যখন তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হলো তখন তাঁর মতে ব্যাখ্যা নিয়ে তর্ক উঠে সঙ্ঘ ভেঙে যাবার যোগাড় হল। এমনি করেই যুদ্ধের পরই সঙ্ঘ থেকে জীবন চলে গিয়েছিল, পড়েছিল শুধু বাইরের একটা আচার। ঠিক তেমনি আজ যেন আমাদের ভিতর থেকে প্রাণটুকু বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে—তার্কিকেরা তাকে ধরে রাখবার কোনো চেষ্টাই করছেন না। কেউ কেউ এত বেশি গোঁড়া আর সাবধানি হয়ে পড়েছেন, কিন্তু ধ্বংসকে ডেকে

* ENGLISHMAN এর Magazine Section হইতে।

আর্মবার মতো সাহস বা ক্ষমতা তাদের আছে বলে মনে হয় না। কারণ আমাদের মনে তো কই সাড়া খুঁজে পাচ্ছি না।

আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, আমাদের ধর্মের ভিতর দিয়ে চলতে হবে। কিসের জন্যে আমাদের ধর্মকে আশ্রয় করতে হবে? ওরে শূদ্র, তুই এবার ওঠ। উঠে বল্, 'আমি ব্রাহ্মণ নয় যে ধর্মের ব্যাখ্যা নিয়ে পড়ে থাকব। আমি আর তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকব না। আমায় বাঁচতে হবে—যেমন করে হোক আমি বাঁচব।' ওরে পতিত, ওরে চিরলাঞ্ছিত, তুই দেখ্ সারা বিশ্ব তোকে ধ্বংস করতে উদ্যত। দেবতা তাঁর জল ঝড় নিয়ে, প্রকৃতি তার রোগ মহামারী নিয়ে তোকে পিষে ফেলতে ব্যস্ত। আচার তার জগদ্দল পাথর তোর বুকে বসিয়ে দিয়েছে—সমাজ তোর কণ্ঠরোধ করে ফেলেছে। ধনীর অট্টহাস্য তোর প্রাণের করুণ কাঁদুনি ঢেকেছে।

কিসের ধর্ম? আমার বাঁচাই আমার ধর্ম। দেবতার জল-ঝড়কে আমি বাঁধব, প্রকৃতিকে আমি প্রতিঘাত দেবো। আচারের বোঝা ঠেলে ফেলে দেবো, সমাজকে ধ্বংস করব। সব ছারেখারে দিয়েও আমি বাঁচব।

আমার আবার ধর্ম কি? যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই, দুপুর রাতে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেঙে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি? যাকে নিজের ঘরে পরে এসে অবহেলায় পশুর মতো মেরে ফেলতে পারে, যার ভাই-বোন বাপ-মাকে মেরে ফেললেও বাক্যস্ফূট করবার আশা নাই, তার আবার ধর্ম কি? দুবেলা দুটি খাবার জন্যই যার বাঁচা, একটু আরাম করে কাল কাটিয়ে দেবার জন্যেই যার থাকা, তার আবার ধর্ম কি?

মানুষের দাস তুমি, তোমার আবার ধর্ম কি? তোমার ধর্মের কথা বলবার অধিকার কি?

ওরে আমার তরুণ, ওরে আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল, তোরা আয়, তোরা ছুটে আয়—এই ভণ্ডামি থেকে চলে আয়। তোরা বল্ আমাদের আগে বাঁচতে হবে। কিসের শিক্ষা? কে শেখাবে? দাস কখনও দাসকে শেখাতে পারে? আমরা কিছু শিখবো না, আমরা কিছু শুনব না; আগে বাঁচব—আমরা বাঁচব।

একবার মনে ভেবে দেখো—তাদের কথা ভেবে দেখো। দেশছাড়া লক্ষ্মীছাড়ার দল আজ কোনো বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে জানে তারা কত মরে গেছে, কত ঘা সয়েছে? তারা তো কথাটি কয়নি। সেই কবে গৃহহীন হয়ে প্রবাস বরণ করে, হাটে-মাঠে বেড়াচ্ছে, তবু তারা কথাটি কয়নি। তাদেরে তপ্তশ্বাস আজ কি তোমার বুকে বয়ে যাচ্ছে না? তুমি যে পথ দিয়ে দিনের পর দিন শুধু সুখের সন্ধানে চলে যাও, তারই একপাশে বদ্ধ ঘরে তারা যে দিনের পর দিন তিল তিল করে মরতে চলেছে, সে খবর তুমি রাখো কি? সেই অন্ধকারে সহস্র আঘাত খেয়ে তারা যে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছে, তাদের ধর্ম কি?

তারা বুঝেছে বাঁচাই তাদের ধর্ম—তারা জানে এই তিল তিল করে মরার ভিতরেই জীবন। তাই তারা ঐ মরণের পথ বেছে নিয়েছে।

ওগো তরুণ, আজ কি তুমি ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকবে—তুমি কি বাঁচবার কথা ভাববে না? ওরে অধীন, ওরে ভণ্ড তোর আবার ধর্ম কি? যারা তোকে ধর্ম শিখিয়েছে, তারা শত্রু এলে বেদ নিয়ে পড়ে থাকত? তারা কি দুশমন এলে কোরআন পড়তে ব্যস্ত থাকত? তাদের রণকোলাহলে বেদমন্ত্র ডুবে যেত, দুশমনের খুনে তাদের মসজিদের ধাপ লাল হয়ে যেত। তারা আগে বাঁচত।

মুশকিল

আজ যে চারদিকে এত কলহ কোলাহল, এর মানে হচ্ছে আমরা যতটা দেশের কল্যাণ চাইছি, তার চেয়ে বেশি চাইছি আত্মপ্রচার বা লোকপ্রতিষ্ঠা। কারণ যখনই আমরা বাইরের খোসা নিয়ে টানাটানি করি তখনই আমাদের অতৃপ্তির মাত্রা বেড়েই চলে—অবশেষে লাঠালাঠি করে নিজেরা রক্তাক্ত হই, আর শত্রুরা হাসে। বাঙালির ভাবোচ্ছ্বাস আছে, কর্মোন্মাদনা আছে। কিন্তু যা নেই সে হচ্ছে জ্ঞান বা জিজ্ঞাসা; কিন্তু এই জিজ্ঞাসা না হলে ভেদ বিষাদের মীমাংসা কোনো কালেই হয় না।

আমাদের দেশের মূঢ় জড় জনসাধারণের, শুধু তাই কেন তথাকথিত শিক্ষিতদের মনে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করার ও সনাতন ধর্মের নামে পুরাতন সংস্কারের দাসত্ব করার মতন মতি, এমন ভীষণভাবে শিকড় গেড়েছে যে, আমরা সত্য ন্যায়ের অনুরোধেও বাধা বিপদের কাঁটাবন কেটে নতুন পথ খুলে নিতে পারলে মুক্তি ও মঙ্গলের পথ অবাধ ও অব্যাহত করবার মতো প্রেরণাও প্রাণে জাগে না। আমাদের এই দেহ-মনের আড়ষ্টতা—এই যে আমাদের হাতে পায়ে খিল ধরে গিয়েছে—একটু নড়ে চড়ে সত্যের বিরুদ্ধতার সাথে লড়ে এগোবার ক্ষমতা নেই, একে কি আমরা মানবতা বলতে রাজি আছি? আজ চাই আমাদের প্রতি কর্ম ও চিন্তায় জীবনের প্রকাশ, প্রাণে চাঞ্চল্য, আর পরিপূর্ণ জীবনের জন্য বিপুল ব্যাকুলতা।

আর আমাদের নিরাশায় মুষড়ে পড়ে থাকার সময় নেই, সবাইকে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জাগতে হবে, গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে। আমাদের অন্তরে, বাহিরে, সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে মৃত্যুর বিষবীজ ছড়িয়ে আছে—সে করাল কবল থেকে আমাদের রক্ষা পেতেই হবে—আর তার জন্যে সর্বাগ্রে চাই স্বরাজ। মুক্তি-পাগল মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব অসহযোগীর কানে বেসুরো বাজতে পারে কিন্তু শুধু চরকা খদ্দর সম্বল করে দেশ যে কত কাল কোনো সুদূর ভবিষ্যতের দিনে স্বরাজের আশায় পথ চেয়ে থাকবে তা বুঝতে পারি না। আর ঐভাবে মদালস গমনে গোরুর গাড়ির চালে চলনে আমাদের স্বাধীনতা আলেয়ার আলোর মতো দূরে আরো দূরে সরে যাবে, মুক্তিদেবী হাততালি দিয়ে বলবেন, 'ও তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে আমায় ধরতে পারলি না'—আর খলখল করে উপহাসের হাসি হেসে চলে যাবেন। চরকা খদ্দরের

আন্দোলন ও প্রচলনে দেশের লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার হচ্ছে, এ দেশের রক্ত শোষণের কলটা বন্ধ হবার অনেকটা পথ হয়েছে বটে। কিন্তু কে না জানে যে, দানবী মায়ার অন্ত নেই, আর তার কুহক জালে জড়িয়ে পড়ে আমাদের সরলপ্রাণ ও শিশুর মতো অজ্ঞান জনসাধারণ আবার ঠুঁটো জগন্নাথ হবে না, মায়ার লোভে ভুলে অমৃত ভাণ্ডের দিকে পেছন ফেরাবে না। গৌরগণ, কত যে প্রেম জানে, কত যে জাদু জানে, তা কি আমাদের জানা নেই? টাকাটা সিকিটা কম দিয়ে বিলেতি কাপড় পেলে অনেকেরই সে মাথা ঠিক থাকে না—অনেকেই সে 'প্রেমে জল হয়ে যাই গলে',—এ আমরা কলকাতা মফস্বল সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। এর মানে কি? তাহলে তো গান্ধি চিত্তরঞ্জনের কাতর আহ্বান সকলের প্রাণকে আলোড়িত করেনি, অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ না হলেও, আজো তা সার্থক হয়েছে বলে মনে হয় না। আজ এদেশের প্রত্যেকের প্রাণের প্রদীপ মুক্তির অগ্নিস্পর্শে জ্বলে ওঠা চাই, সমস্ত দেশে আজ নতুন করে নবজাগরণের বিপুল সাড়া জাগিয়ে তুলতে হবে, আজ এমন প্রচণ্ড আগুন জ্বালা চাই, স্বাধীনতার শান্তিবারি ছাড়া যার প্রশমন হতে পারে না। স্বরাজ-সাধনায় শিশুর মতো শুদ্ধি সরলতার আবশ্যকতা আছে, স্বীকার যাই, কিন্তু তার চেয়ে যার বেশি প্রয়োজন সে হচ্ছে যৌবনের শক্তি ও একান্ত নিষ্ঠা। আজ ছোট লোকটির মতো 'চলি চলি পা পা' করে খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়লে চলবে না। আজ যদি আমরা মুক্তির আলো-ঝরনায় অবগাহন করে নবজন্ম ও নতুন চেতনা লাভ করে থাকি তাহলে আমাদের অহিরাবণের মত বীরবিক্রমে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হতে হবে।

আমলাতন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের শক্তি পরীক্ষা করতে হলে কাউন্সিল ভেঙে দেওয়া যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, যারা পূর্ণ মুক্তির বিরোধী তাদের শাসনযন্ত্র হতে বেদখল করা এবং বুরোক্রেসি শাসন যে নেহাত ভুয়ো ছেলেখেলা ও আমাদের সকল অমঙ্গলের আদি নিদান তা প্রতিপন্ন করে গভর্নমেন্টের গিলটি করা, মুখোশ খুলে তার বিকৃতস্বরূপ ভালো করে দেখাতে পারা যে একান্ত দরকার আর তাতে যে অসহযোগীদের ভাগবত অশুদ্ধ হবে না—এই হচ্ছে এক দলের মত। সত্যি মুক্তি সাধনকে একটি গৌণ কর্ম মনে করে আমরা যে সকলেই পুরানো থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়ের তালিম দিচ্ছি—এটি নিতান্ত অসহ্য ব্যাপার, কিভাবে আমাদের শক্তি, তেজ উঠে নিভে যাচ্ছে তাতে আমরা যে এগিয়ে না গিয়ে পেছিয়ে যাচ্ছি—তা অস্বীকার করা চলে না।

আর একদল হচ্ছেন পুরাতনপন্থী তাঁরা পরিবর্তন চান না, কাউন্সিলে গেলে দেশের কথা মনে থাকবে না—মন সাহেবি খানায় বিগড়ে যাবে। তারপর কাউনিসলের জন্য ভোট একচেটে করে দেওয়া, কর্তাদের কাউন্সিল বাতিল করে দেওয়া যাবে না—ও এমন বিষয় নয়, যা নিয়ে শক্তি ক্ষয় করে কোনো সুসার হবে। আর যে জিনিসকে অশুচি বলে বর্জন করা হয়েছে—তার সংস্রব থেকে দূরে না থাকলে আত্মা অশুদ্ধ হয়ে পড়বে।

কাউন্সিলে গিয়ে তার ফটক আটকে দিয়ে কেল্লা ফতে যাঁরা করতে চাইছেন, আর যাঁরা বলছেন ও স্থান মাড়ালেই মহাপাপ, এদের দু দলকেই জিজ্ঞাসা করছি—যে, তাঁরা দু দশটি সুখের পায়রা, ননীর পুতুল কি মুক্তিসংগ্রামের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা

ধারণ করেন? তাঁরা লড়বেন যেসব লড়িয়ে সেপাইদের নিয়ে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে কি? তাদের অন্তরের বেদনার সন্ধান করে তার প্রতিকারের পথ দেখাবার জন্য তো অগ্রসর হতে হবে। তাদের শুষ্ক শূন্য জীবনের সুখ ও শক্তির রুদ্ধ উৎসটি তো খুলে দিতে হবে। শুধু নৈবিদ্যির চিনি দিয়ে তো দেবতার তৃপ্তি হবে না। আজ প্রচুর অন্নের ব্যবস্থা চাই, যারা দেশের শিরদাঁড়া তাদের শক্ত করতে হবে। নিচের মানুষদের টেনে উপরে তুলতে হবে তাদের মনে মুক্তিপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে পারলে পথ আপনি ঠিক হয়ে যাবে। কাউন্সিল করতে হবে কি না হবে তা নিয়ে আজ লাঠালাঠি করে ফল নেই, ও দড়ি এত শক্ত নয় যে, দুদিকের অত ভীষণ টান সইতে পারে, এতে নিজেদের পতনের পথই প্রশস্ত হচ্ছে। এ ঝগড়া কি ধামা-চাপা দেওয়া যায় না, কাউন্সিল স্বরাজের কি গয়ায় পিণ্ডিদান হয় না?

দেশের কাজ পল্লিগঠন করতে হবে। মূক মৌনমুখে মুক্তির কলরব জাগিয়ে তুলতে হবে। সকল প্রকার মিথ্যা অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাতে জনসাধারণ অকুণ্ঠচিত্তে পরিপূর্ণ বিদ্রোহ করতে পারে, তার ব্যবস্থা চাই, আর তা না হলে শুধু ভদ্রলোকের জটলাতে স্বরাজের পাকা বুনিয়াদের প্রতিষ্ঠা হবে না—এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্য চাই—এই অগণিত জনসাধারণ যাতে পূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয়, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল রকম অবিচার কদাচারের বিরুদ্ধে, অন্তরে ভগবত্তার স্পর্শ ও অনন্ত শক্তি অনুভব করে, মাথা খাড়া করে দাঁড়াবার মতো বল পায় সেইজন্য চেষ্টা ও আন্দোলন করা। এই ছত্রভঙ্গ ছিন্নভিন্নবিবাদ-ক্ষিপ্ত বিরাট জনশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও চালিত না করতে পারলে অত্যাচারীর দম্ভকে স্তম্ভিত করা যাবে না। আজ সেই সাধক ও সিদ্ধ নেতা কোথায়, যিনি এই দীনহীন জীর্ণ মলিন আচণ্ডাল ভারত সন্তানের বিষণ্ণ মুখে হাসির ও তেজের আলো ফুটিয়ে তুলবেন—বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? তাই বলছিলাম মুশকিল।

লাঞ্ছিত

মানুষ চিরকাল মানুষের উপর যে অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, তাহা পশুদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ মানুষ একটি চিন্তাশীল পশু। তাহার বুদ্ধি এত প্রবল যে, ইচ্ছা করিলেই সে তাহার ভিতরকার পশুটিকে দুর্দান্ত এবং নির্মম করিয়া তুলিতে পারে। পশুর চেয়ে তার সুখ আরামের স্পৃহা একবিন্দু কম নয় এবং এই নিমিত্ত সে পৃথিবী কেন সৌরজগৎটাকে ধরিয়া বাঁধিয়া তার আরামের যন্ত্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তাই রেল, স্টিমার, বিদ্যুৎ গাড়ি, কলকারখানা একটির পর একটি করিয়া মানুষের আরামের নিমিত্ত সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং এই নিমিত্ত বায়ু, বিদ্যুৎ হইতে আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি মনুষ্য পশুপক্ষী, অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন

মনুষ্য-পশুর দাসখৎ লিখিয়া দিতে বাধ্য হইতে লাগিল। কেহ ধর্মের নামে, কেহ বা সমাজ, শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে কোটি কোটি জীবনকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে লাগিল। ফলে আজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া ইউরোপীয়গণ এশিয়া ও আফ্রিকার ধর্ম ও সমাজ শাসন করিতেছে, আবার আমাদের সমাজে কতকাল ধরিয়া মুষ্টিমেয় তথাকথিত উচ্চজাতীয় নিম্নজাতির ধর্ম ও সমাজ রক্ষা করিয়া তাহাদের পরলোকে সম্পত্তি করিতেছে। গৃহ শিল্প নষ্ট করিয়া ধনী কল স্থাপন করিলেন, অংশিদারেরা শতকরা পঞ্চাশ টাকা লাভ করিয়া স্বদেশির কল্যাণ হউক বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। কিন্তু সহস্র সহস্র শিল্পী কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়া জাত ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া রাস্তায় দাঁড়াইল। তাই আজ শত সহস্র তাঁতি জোলা, কামার কুমার বৈরাগী হইয়াছে। সহস্র লোক স্ত্রীপুত্র লইয়া কুলির কাজ করিতেছে। দিন দিন চুরিডাকাতি বৃদ্ধি পাইতেছে। লক্ষ লোকের অন্ন সংস্থানের সর্বনাশ করিয়া চারি পাঁচশত লোক ধনী হইলেন এবং বিলাস-ব্যসনে অর্থব্যয় করিলেন।

উকিল দেখিতেছে মক্কেলের কত খাওয়া যায়। মহাজন দেখিতেছে দেনাদারের ভিটেমাটিটুকু কি করিয়া নেওয়া যাইতে পারে, ভদ্রলোক ভাবিতেছে ঢং দেখাইয়া কত বোকা ঠকানো যাইতে পারে। কেউ বা বুদ্ধি বিক্রয় করিতেছেন, কেউ বা দেশনীতির মেলা খুলিয়া বসিয়া আছেন। সবাই কে কার মাথা খাইবেন ভাবিয়া অস্থির। পরের ভাবনা ভাবিবার তিলমাত্র সময় নাই। এই যে সারাদিন এত ব্যস্ততা সে শুধু কি করিয়া দুর্বলকে পেষণ করিয়া আর একটু বড় সঞ্চয় করা যায় তাহার চেষ্টার নিমিত্ত।

ভারতবর্ষে শতকরা সত্তর জন চাষি। তারা আজ অহরহ পরিশ্রম করিয়া দুবেলা খাবার অন্ন জোগাড় করিতে পারে না। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা অসদুপায়েও স্ত্রী-পুত্রের মুখে ভাত তুলিয়া দিতে পারে না। রোগ লইয়া দুর্ভিক্ষ ঘরে ঘরে মহাজনের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এদিকে উচ্চজাতি মৃত্যুকালেও নিম্নজাতিকে এক ধাপ উপরে উঠিতে দিবে না। জমিদারের জমি নিলামে, তবু সে প্রজার হাত ধরিবে না। বাবুরা ছোটলোকদের এখনও দূরে রাখিতেছেন। এ দেশি বড়লোকেরা ধর্ম সমাজ এমনকি রাজনীতি ক্ষেত্রেও আভিজাত্য ও কালচারের গর্বটুকু ভুলিতে পারিতেছেন না। সমস্ত জাতিটা যেন মরণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এমনি সময়ে যত দেশের যত লাঞ্ছিত, তাহাদের ব্যথা বুকে লইয়া মহাত্মা ভারতের শহরে শহরে ঘুরিতে লাগিলেন। আর বলিতে লাগিলেন, 'কে আছ লাঞ্ছিত পতিত। ওঠো! জাগো! মুক্তি তোমার দুয়ারে। তুমি উঠিয়া তোমার প্রাপ্য বুঝিয়া লও।'

স্বরাজের আশায় নাকে রুমাল দিয়া বাবুর দল ন্যাংটা সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মহাত্মার কথায় সায় দিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু অস্পৃশ্যতা আর নিচু জাতির উন্নতির কথায় বিশেষ কান দিল না। এমনকি খদ্দর জিনিসটাকেও সুবিধামতো মিশ্র খদ্দর করিয়া লইতে দ্বিধা করিল না।

নিম্ন জাতি—জাতির অধিকাংশ লোক—যেখানে ছিল, বাবুর সমাজ তাহাদিগকে সেইখানেই চাপিয়া রাখিল। আর যেই আন্দোলনে মন্দা পড়িল অমনি বাবুর দল খেপিয়া

উঠিল 'কদ্দরে স্বরাজ হইবে না।' নিম্ন জাতির কথা বলাও যা, ভূতের কাছে রাম নাম করাও তাই।

তাই মহাত্মা জেলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, লক্ষ্মী কেমন আছে? লক্ষ্মী মহাত্মার পালিতা নীচজাতীয়া কন্যা। তিনি লক্ষ্মীর নামে সকল নীচ জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

কে আছ পতিত, লাঞ্ছিত, কে আছ দীন, হীন, ঘৃণিত, এস। যে শক্তিবলে তোমার ভাইরা ফরাসির হাজার বছরের অত্যাচার ও আভিজাত্য দুই দিনে লোপ করিয়া দিয়াছিল, যে অন্যায় সাইবেরিয়ার লক্ষ বন্দি সন্ত্রাসদাতা দুর্ধর্ষ সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন ভাসিয়া গিয়াছিল, যে শক্তিময়ীর বিকট হাস্য সমস্ত জগতের অত্যাচারকে উপহাস করিয়া ধনগর্বিতদের গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই শক্তিময়ী সেই সর্বনাশের বন্যা লইয়া তোমার দুয়ারে উপস্থিত, ওঠো, ভাই; মাকে বরণ করিয়া লও।

নিশান-বরদার

[পতাকাবাহী]

ওঠো ওগো আমার নির্জীব ঘুমন্ত পতাকাবাহী বীর সৈনিক দল। ওঠো, তোমাদের ডাক পড়েছে—রণদুন্দুভি রণভেরী বেজে উঠেছে। তোমার বিজয়-নিশান তুলে ধরো। উড়িয়ে দাও উঁচু করে ধরে; তুলে দাও যাতে সে নিশান আকাশ ভেদ করে ওঠে। পুড়িয়ে ফেলো ঐ প্রাসাদের উপর যে নিশান বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করছে ভেঙে ফেলো ঐ প্রাসাদশৃঙ্গ। বলো আমি আছি। আমার সত্য আছে। বলো আমরা স্বাধীন। আমরা রাজা। বিজয়পতাকা আমাদের; আর কারো জন্য নয়। মনে প্রতিজ্ঞা কর যে, নিশান ওড়াব আমরা। আমাদের বুকের উপর ও নিশান আর কাউকে ওড়াতে দেবো না। ও নিশান জ্বালিয়ে দেবো। শপথ করো, যদি ও নিশান আবার তুলে ধরতে চায় তবে এমন শাস্তি দেবো, যা তারা মরণের পরপারে গিয়েও তার জ্বালা ভুলতে না পারে। শয়তানকে জয় করে দেশত্যাগী করতে হলে, তাদের বুকের উপর রক্ত উড়িয়ে দিতে হবে।

আমাদের বিজয়-পতাকা তুলে ধরবার জন্যে এস সৈনিক। পতাকার রঙ হবে লাল, তাকে রঙ করতে হবে খুন দিয়ে। বলো আমরা পেছাব না। বল আমরা সিংহশাবক, আমরা খুন দেখে ভয় করি না। আমরা খুন নিয়ে খেলা করি, খুন দিয়ে কাপড় ছোপাই, খুন দিয়ে নিশান রাঙাই। বলো আমি আছি, আমি পুরুষোত্তম জয়। বলো মাভৈ মাভৈ জয় সত্যের জয়।

আমি আছি বলে নিশান হাতে তুলে নাও। এস দলে দলে নিশানধারী বীর সৈনিক ভাইরা আমার। নিজেকে সৈনিক বলে প্রচার করি, এস। এস, শয়তানকে অর্ধেক পুঁতে ফেলে তার মাথার উপর তাদেরি মাথার মগজের চর্বি দিয়ে চেরাগ জ্বালাই। শয়তানকে

দগ্ধ করে করে মারতে হবে। এই কথা বলে বেরিয়ে এস—আমি আছি, আমাতে আমিত্ব আছে, আমি পশু নই, আমি মনুষ্য, আমি পুরুষসিংহ। আমাদের বিজয়ী হতে হবে। বিজয়-পতাকা ওড়াতে হলে খুন খোশরোজ খেলা খেলতে হবে। ধরো ধরো এক হাতে ভীম খড়্গ সর্বনাশের ঝাণ্ডা আর—আর এক হাতে ধরো রক্তমাখা পতাকা। আমাদের এই বিজয়-মঙ্গলের সময় যদি কেউ বাধা দিতে আসে তবে তাকে ধড় থেকে অর্ধেক ছাড়িয়ে নিয়ে অর্ধেক সাগরজলে ভাসিয়ে দাও আর অর্ধেকখানা সেখানে পড়ে দুপায়ের গিঁটে গিঁটে যেন ঠোকাঠুকি করে।

আঘাতের দেবতাকে এনে তোমার মগজের ভিতর বসিয়ে নাও। কালী করালীর হাত থেকে ভীম খড়্গ ছিনিয়ে আনো। উচ্চ প্রাসাদ-শিরে যে পতাকা উড়ছে তাকে উপড়ে ফেলে সেখানে আমাদের বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দেবো বলে বেরিয়ে পড়ো। চেয়ে দেখো তোমার মা 'মেয় ভুঁখা হুঁ' বলে চিৎকার করে করে বেড়াচ্ছে, সর্বনাশী বেটিকে শান্ত করো। নাহলে সে নিজেরে ছেলের রক্ত খেতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

যে নরনারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করে, ভীরুতা শিখিয়ে দাস করে রেখে দেয়, তাকে তোমরা ক্ষমা করো না। তার কণ্ঠ চিরে উষ্ণ রক্ত পান করো। তোমাদের পূর্বস্থান তোমরাই দখল করে তার উপরে তোমাদেরই বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দাও।

তোমার পণ কি

নিবিড় অরণ্যমধ্যে গভীর নিশীথে শব্দ হইল, 'আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে?' নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে প্রশ্ন করিল, 'তোমার পণ কি?' আবার শ্রুত হইল, 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব।'

—জীবন তো তুচ্ছ কথা, আর কি দিবে?

—আর কি আছে? আর কি দিব?

উত্তর হইল, ভক্তি!

ওরে আমার তরুণ সাধক, আজ ঐ শোন আঁধার ভেদ করিয়া কার প্রশ্ন শোনা যাইতেছে, 'তোমার পণ কি? তুমি কি সিদ্ধিলাভ করিতে চাও? পিশাচের অত্যাচারে তোমার বুকে কি রণলিপ্সা জাগিয়া উঠিয়াছে? দুর্বৃত্ত দলনের নিমিত্ত সংহারমূর্তি লইয়া ভগবান কি তোমার হৃদয়ে আসিয়াছেন? পদ-মদ-মত্ত রাক্ষসের কণ্ঠনালী ছিন্ন করিবার লোভ কি তোমার হৃদয়ে জাগিয়াছে? ওরে আমার বাংলার সাধক! তোমার প্রাণে কি রুদ্র বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে? তাহা হইলে বলো, তোমার পণ কি?

ঐ দেখো অত্যাচার তার সহস্র ফণা দোলাইয়া বিশ্বতরু গ্রাস করিতে উদ্যত, প্রাণে প্রাণে পদাহতা দেবতার তপ্ত শ্বাস, ঘরে পীড়িতের ক্রন্দন। তুমি এ কালনাগকে পিষিয়া মারিতে পারিবে? তুমি কি বুকে বুকে আগুন জ্বালাইতে পারিবে? তাহা হইলে বলো, বীর, 'তোমার পণ কি?

বলো, 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব।' দুয়ারে আঘাত করিয়া বল—'ওগো, কে আছ পতিত, কে আছ শূদ্র, তোমরা ওঠো, এ বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এ সংসার যে ভেঙে ফেলতে হবে। তোরা আয়, কার কাঁচা প্রাণটা বলি দেবার লোভ হয়েছে আয়, তোরা আয়।'

একবার—ওরে একবার তোরা ঐ তন্দ্রালসের বুকে আঘাত কর্, একবার তোরা চেঁচিয়ে বল্, 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব।' আবার প্রশ্ন হইল, জীবন তো তুচ্ছ কথা, আর কি দিবি? ওরে তরুণ, ওরে মাতাল, প্রাণ তো তুচ্ছ কথা, আর কি দিবি? তোদের দয়া, তোদের মায়া, তোদের আশা, তোদেরে ব্যথা—তোদের আর কি দিবি? তোদের মনের কোণে কি সুখের আশা আছে? ওরে দুঃখী, ওরে হিংস্র, তা ভেঙে ফেল্। সে যে সবটুকু চায়!

আর কি দিবে?

বাংলার ছেলে তুমি বলো, 'আমি সব দেবো, আমি সব নেব।' পারিবে কি? যখন অগ্রসর হইতে হইতে একটি একটি করিয়া সেনাপতি আহত হইয়া পড়িবে, তখন সেই শ্মশানে নিজ স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারিবে কি? শত্রুর সেনা যখন তোমার ঘরে রক্তস্রোত বহাইয়া দিবে, তখন তোমার চক্ষু পশ্চাতে ফিরিবে না তো? প্রিয়তম বলির করুণ ক্রন্দনে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিবে না তো? তাই বুঝি সে কঠোর স্বরে বলিতেছে, 'আর কি আছে, আর কি দিবে!' ভীষণ দুর্দিন। শত্রুরা একবার শেষ চেষ্টা করিতেছে। দেশে দেশে দানবরাজেরা ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। যুগবাণীর কণ্ঠ রোধ করিয়া ফেলিবার জন্য তাহাদের রক্তাক্ত নখর প্রসারিত। ওগো, মরণপথের পথিক, তোমরা পারিবে কি? ক্ষত-বিক্ষত দেহেও তাহার বক্ষে আঘাত করিতে পারিবে কি?

একে একে সেনাপতি সরিয়া যাইতেছে। অন্ধকার, ওরে চারিদিকে অন্ধকার। তোমার এ অন্ধকারে চলিতে পারিবে তো? পথ-বাহক যদি হাত ছাড়িয়া দেয় তবে পথ ভুলিবে না তো? মাতার ক্রন্দন, প্রিয়ার ব্যাকুলতা—দলিত করিয়া একা এই অন্ধকারে পথ চলিতে পারিবে তো? তবে বলো, তোরা বলো—

ওরে চারিদিকে মোর
একি কারাগার ঘোর
ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা
আঘাতে আঘাত কর্।

ভিক্ষা দাও

ভিক্ষা দাও! পুরবাসী, ভিক্ষা দাও! তোমাদের একটি সোনার ছেলে ভিক্ষা দাও!

আমাদের এমন একটি ছেলে দাও, যে বলবে আমি ঘরের নই, আমি পরের। আমি আমার নই, আমি দেশের।

ওগো তোমরা চেয়ে দেখো সর্বনাশা আমাদের বুকের উপর চেপে বসে আছে। কোটি কোটি লোক দুমুঠো ভাতের জন্য হা হা করে ছুটছে। ওগো ঐ দেখো কোটি কোটি ভাই আধপেটা খেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের বুকে হাত দিয়ে দেখো সেখানে আর প্রাণ নাই, তোমাদের হৃদয়ে অনুভব করে দেখো সেখানে আর বল নাই। ওগো বলি চাই। বলি চাই। তোমাদের একটি ছেলে বলি চাই।

ওগো সংসারী! কোথা যাও। তুমি কি সুখ পেয়েছ? পদে পদে অভাব আর অধীনতায় আহত হয়ে তুমি এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তি পেয়েছ? ওগো! তুমি তো শান্তি পাবে না। তুমি তো যুদ্ধে তোমার ছেলে দাও নাই। ওগো, ভিক্ষা দাও, একটি সোনার ছেলে ভিক্ষা দাও।

ওগো পূজারী, কোথায় অর্ঘ্য দিতে চলেছ? বুকে বুকে দেবতার তপ্ত শ্বাস হু হু করে বয়ে যায়—তুমি কার কাছে ডালি নিয়ে যাও। ও কি নিয়ে যাচ্ছ তুমি! ফুল আর পাতায় তোমরা দেবতা কি তুষ্ট হবেন? বুকে তার তীব্র জ্বালা, চোখে তার হিংস্র বহ্নি। ওগো, সে তো ফুল পাতা চায় না, সে চায় কাঁচাতাজা প্রাণ। ওগো, বলি দাও—বলি দাও।

ওরে তরুণের দল। একবার ফিরে দাঁড়াও।

কোথা যাও তোমারা অন্ধের মতো, কোথায় চলেছ তোমরা? ঐ যেন চাষীর শত শত রক্ত প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে তাদের দলিত করে কোনো উন্নতির দিকে ছুটে চলেছ? তোমার বুকের ভিতর যে দেবতা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে তার কণ্ঠরোধ করে কোনো মায়াবীপুরের দিকে চলেছ? কান পেতে শোনো কাদের কান্নার ধ্বনি আকাশে পাতালে ধ্বনিত হচ্ছে। তোমরা কি তোমাদেরে অলস বাঁশি দূর করে দেবে না? চোখ মেলে দেখো, সব গেল। সব গেল। তিল তিল করে সব যে শেষ হয়ে গেল। ওগো তরুণের দল, তোমাদের ভিতর কি এমন লক্ষ্মীছাড়া কেউ নেই—যে বলে, আমি তিল তিল করে করে বাঁচব না। আমি ঘরের মায়ায় ভুলব না, ঘর আমার স্থান নয়, ঐ কাঁটাবন আমার ঘর, দুঃখ-দারিদ্র্য আমার সম্পত্তি, মৃত্যু আমার পুরস্কার। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে এই ভীষণ আঁধারে নিজের বুকের আগুন জ্বেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়? তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে বলতে পারে, আমি আছি, সব মরে গেলেও আমি বেঁচে আছি; যতক্ষণ আমার প্রাণে ক্ষীণ রক্তধারা বয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তা দেশের জন্য পাত করব। ওগো তরুণ, ভিক্ষা দাও, তোমার কাঁচা প্রাণ ভিক্ষা দাও।

ওরে তরুণের দল! একবার বুকে হাত দিয়ে বল্ দেখি একবারও কি এ নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়নি? একবারও কি এই জগদ্দল পাথর ঠেলে ফেলতে ইচ্ছা হয়নি? ওরে ওঠ, ওরে তোরা ওঠ, দূর করে দে জড়তা, ছিঁড়ে ফেলে দে বন্ধন। হৃদয় থেকে কোমলতা দূর করে দে। শয়তানের হিংসা নিয়ে শত্রুর পানে একবার ছুটে চল্। বিশ্বের গরল প্রাণে ঢেলে দে। তোরা বিশ্বময় বিষ ছড়িয়ে দে, সুখের সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যাক। অত্যাচার! অত্যাচার ঐ দেখো অত্যাচার তার ভীষণ মূর্তি ধরে বসেছে। ধনী তার ধন নিয়ে, বলবান তার লাঠি নিয়ে, কাজী আর পণ্ডিত তার শাস্ত্র দিয়ে মানুষকে

হত্যা করবার কি ভীষণ চেষ্টা করছে। ঐ শোন্ তাদের তাণ্ডব চিৎকার। ঐ দেখ্ কি বিকট মূর্তি।

কে আছ বীর, তার টুটি ধরে মারতে পারো। কে আছ, দুঃসাহসী, তার সহস্র ফণা নিয়ে খেলতে পারো। কে আছ নাস্তিক, কে আছ হিংসুক, কে আছ বিদ্রোহী, এসো! কে আছ তরুণ, কে আছ পাগল ভিক্ষা দাও, তোমার মাতাল প্রাণটি ভিক্ষা দাও।

কামাল

যাক, এতদিনের পর একটা ছেলের মতো বেটাছেলে দেখলাম। এমন দেখা দেখে মরতেও আর আপত্তি নাই। এতদিন দুঃখ হতো যে, এই হিজড়ে নপুংসকগুলোর মুখ দেখে মরবার পাপে হয়তো আবার শুয়োর হয়ে জন্মাতে হবে, কেননা হিজড়ের মুখ দেখে যাত্রার মতো অলক্ষুণে কোনো কিছু আছে কিনা জানি না। কিন্তু হঠাৎ একি শুনি? ও কার বিষাণ বাজে? ও কার তরবার মরা সৃষ্টির বুকে জীবনের বিদ্যুৎ হেনে যায়? বিশ্বে যখন, 'যেদিকে ফিরাই আঁখি, কেবল মাদিই দেখি' অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই সময় মদ্দা পুরুষ কামাল এল তার বিশ্বত্রাস মহা তরবারি নিয়ে সামাল সামাল করে রোজ কিয়ামতের ঝঞ্ঝার মতো, রুদ্রের মহারোষের মতো। অত্যাচারীর মুখে গোখরো সাপের বিষাক্ত চাবুক মেরে মুখ ছিঁড়ে ফেললে খ্যাপা ছেলে। ঘুষি মেরে তার মুখটা ঘুরিয়ে দিলে, পেঁদিয়ে তিন ভুবন দেখিয়ে দিলে। হাঁ, ব্যাটাছেলে বটে বাবা, একেই বলে বাপের ছেলে সুপুত্তুর। ইচ্ছা করছে, খুশির ছোটে তার পায়ের কাছে পড়ে নিজের বুকে নিজেই খঞ্জর বসিয়ে দিই। এই তো সত্যিকারের মুসলিম। এই তো ইসলামের রক্ত-কেতন। দাড়ি রেখে গোশত খেয়ে নামাজ-রোজা করে যে খিলাফত উদ্ধার হবে না, দেশ উদ্ধার হবে না, তা সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল, তা নাহলে সে এতদিন আমাদের বাঙলার কাছা-খোলা মোল্লাদের মতন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাছা না খুলে কাবার দিকে মুখ করে হর্দম ওঠবোস্ শুরু করে দিত। কিন্তু সে দেখলে যে বাবা, যত পেল্লাই দাড়িই রাখি আর ওঠবোস্ করে যতই পেটে খিল ধরাই, ওতে আল্লার আরশ কেঁপে উঠবে না। আল্লার আরশ কাঁপাতে হলে হাইদরি হাঁক হাঁকা চাই, মারের চোটে স্লষ্টারও পিলে চমকিয়ে দেওয়া চাই। ওসব ধর্মের ভণ্ডামি দিয়ে ইসলামের উদ্ধার হবে না—ইসলামের বিশেষ তলোয়ার, দাড়িও নয়, নামাজ-রোজাও নয়।

তাই সে সিধে মালকোঁচা এঁটে কোমর বেঁধে বম্বু কাঁধে তুলে, দে ধনাধ্বন মার ধনাধ্বন জুড়ে দিলে। আল্লাতায়ালাও তার কথা শুনলেন, ডাকাত ব্যাটারা মুক্তকচ্ছ হয়ে চোঁ চোঁ দৌড় মারলে। তাই বলি কি, ভাই রে তোদের ঐ ধনুষ্টঙ্কারী চেহারার হিজড়ে মার্কা ফাঁকির প্রেম-বাণীটানি দিয়ে কিছু হবে না, ওসব ভণ্ডামি ছেড়ে দে। সোজা 'হল বলরাম স্কন্ধে' অজামিলের মতো বম্বু ঘাড়ে তুলে বেরিয়ে পড়। ডাকাত কখনও তোমার

হাতে বম্বু দিয়ে বলে দেবে না যে, নাও বন্ধু, পিঠ পেতে দিলেম, তুমি পিটাও। ওটা নিজে জোগাড় করে দিতে হবে। এখন ঐ উপায়টাই দেখো। এর চেয়ে সোজা সহজ সত্যি বোম্ কেদারনাথ বলে। আপনি আল্লা ভগবান সবাই সহায় হবে তোমার।

প্রেমের খোশামোদিতে নিদ্রিত নারায়ণের ঘুম ভাঙে না। ওঁর দোরে প্রচণ্ড ঘা দিতে হয়। ভৃগুর মতো বুকে লাথি মেরে জাগাতে হয়। রেগো না বন্ধু, যতই রাগো, এটা তাঁহা সত্যি যে, মারের মতো বড় জিনিস এখনো সৃষ্টি হয়নি দুনিয়ায়।

ভাববার কথা

আর দুই এক দিন পরেই তীর্থ, বৌদ্ধ তীর্থ, ভারতের অন্যতম প্রাচীণ গৌরবময় ঐতিহাসিক গয়া নগরীতে ভারতের শত শত জাতি সম্প্রদায়ের একীভূত মহামিলন জ্বাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন। সহস্র সহস্র হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পার্শি, আর্য, ব্রাহ্ম এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নরনারী আমাদের ছিন্ন-ভিন্ন, উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, শত অত্যাচারে জর্জরিত, রোগ-শোক-প্রপীড়িত, ভীত-ত্রস্ত তেত্রিশ কোটি মানবের জীবনমরণের সমস্যা, ইহজীবনের সুখ-দুঃখের আলোচনা করবার জন্যে সম্মিলিত হবেন।

সাঁইত্রিশ বৎসর আগে একদল মুক্তিকামী,—আজ আমরা তাদের যা-ই বলি না কেন, আমাদের ওষ্ঠে, পৃষ্ঠে, ললাটে হাজার বন্ধনের প্রথম জ্বালা অনুভব করেছিলেন, তাই হয়েছিল জাতীয় মহাসমিতির প্রথম বীজ বপন। সেই থেকে প্রতি বৎসর সারা বৎসরের পুঞ্জীভূত বেদনা ও আশা নিয়ে মহাসমিতির এক একটি অধিবেশন হয়েছে, একটু একটু আলোচনা হয়েছে, পূর্বের সারা বৎসরের গুপ্ত বেদনা একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে কংগ্রেস অধিবেশনের ফলে পরিস্ফুট হয়েছে আর পরবর্তী সারা বছর সেই বেদনায় হাত বুলিয়ে, আরে রোগ বিকারের প্রলাপে কেটে গিয়েছে।

১৯০৫ সালে এই বেদনা তীব্র হয়ে ১৯০৬ সালে মূর্ত হয়ে উঠল। পূর্বে যারা কাউন্সিলে যাবার উপযুক্ত, শাসন করবার উপযুক্ত, মোকদ্দমা চালাবার উপযুক্ত, এমনই সব মহারথীর মায়ের পূজার আয়োজন করতেন। প্রত্যের জেলার দুই একজন নামজাদা লোক সেই জাঁকজমকের পূজায় সম্বৎসরের মতো তিন দিন পুষ্পাঞ্জলি দিতে যেতেন। সে পূজায় বিশেষ কোনো বর লাভের সম্ভাবনাও ছিল না, পাওয়া যেত না। এদিকে জাতির উপর উৎপীড়ন, বন্ধন, জারণমারণ, বশীকরণ বুরোক্রেসির দিক থেকে সমান বেগে চলতে লাগল। শেষে তখনকার মতো তার মাত্রা পূর্ণ করবার জন্যে ১৯০৫ সালে অপেক্ষাকৃত উর্বরমস্তিষ্ক বাঙালিদের, বিশেষত হিন্দু-মুসলমানের মনের ভিতরে বিষবৃক্ষের বীজ পুঁতবার জন্যে বাংলাদেশকে কাটবার ব্যবস্থা হলো। বুরোক্রেসির কসাইখানার ছোরা যতই ধারালো ও ভারী হোক না কেন, এবার দেখা গেল বাংলা তো

তাতে কাটলই না, উপরন্তু ছোরা যেন চুম্বকশক্তিতে সারা ভারতের সমস্ত টুকরা কুড়িয়ে নিয়ে এসে সত্যি সত্যিই একটি জাতি গড়বার জন্যে ১৯০৬ সালে কলকাতার ময়দানের পাশে জন্মায়েত হলো। জাতীয় মহাসমিতির বীজ সেইবার অঙ্কুরিত হয়ে চারা বেরুল।

আমাদের জাতির গুণই হোক আর দোষই হোক—স্বভাবটা এমনই যে তার পাকা জমিনের উপর সহসা কেউ নতুন রঙ ধরাতে পারে না। আবার যেটুকু রঙ ধরে, তাও সহসা মুছতে চায় না। ১৯০৭ সালে বাঙালির ছেলেরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা ও উন্মাদনায় সারা ভারত জাগাল, ভারতাজোড়া মহামারী কাণ্ড বেঁধে গেল। জাতীয় যজ্ঞের পৌরোহিত্য তরুণের হাতে গিয়ে পড়ল।

তখন কংগ্রেসও ছিল বুরোক্রেসির অঙ্গ, কারণ এক মূর্তিতে যাঁরা বুরোক্রেসিকে সেবা করতেন তাঁরা আর এক মূর্তিতে কংগ্রেসের সেবা করতেন। কোনো উদ্ধত মুক্তিপাগল ছেলে যদি কোনো কংগ্রেসের পাণ্ডার সম্মুখে 'গবর্নমেন্ট ভেঙে দেও' এমন কথা উচ্চারণ করত, তবে পাণ্ডাঠাকুর নিশ্চয়ই পুলিশ ডেকে তাকে ধরিয়ে দিয়ে বাহাদুরি নিতেন। এতদিনে সত্যিই মুক্তিকাম একটা দলের প্রাণের ভিতরে বাঁধনের একটা তীব্র মোচড়ানি অনুভূত হলো। সেই মোচড়ানিতে অঙ্গের তনুমনপ্রাণ মুচড়িয়ে উঠল, পেশিগুলি সারা অঙ্গেরই এমনি ফুলে উঠল যে পটাপট একটা ঝটকায় সব বাঁধনগুলো ছিঁড়ে গেল। তারা অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গা ঢাকা দিল। আলোর দিকেও জাতীয় বিদ্যালয়, কাপড়ের কল, টেকনিকাল স্কুল, সাবানের কারখানা, দেশ-বিদেশে গিয়ে চাষবাস, কলকব্জা শেখা, চালানো ইত্যাদি হতে লাগল। তখন মহাসমিতি গাছে পরিণত হয়েছে। এইবার বুরোক্রেসি দানব তার হাজার হাজার চ্যালাচামুণ্ডা নিয়ে এই গাছ কাটতে খাঁড়া তুলল। গাছ আবার মুষড়ে পড়ল, কিন্তু রক্তবীজের গাছ একেবারে মরল না। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত এমনি করে আঁধার কেটে গেল। এই সময় বিধাতার বিধানে বুরোক্রেসির হাত দিয়ে পাঞ্জাবে এই মুষড়ে-পড়া গাছের গোঁড়ায় রক্তের তরল সার ছিটিয়ে দেওয়া হলো। সেই থেকে মহাসমিতিতে এই চার বছর ধরে সংঘর্ষই হয়ে আসছে। জাতীয় তরু এখন পুষ্পিত। অনবরত আঘাত খাওয়া তার সয়ে গিয়েছে। সহস্র তীক্ষ্ণ কুঠার তাকে সমূলে বিনাশ করবার জন্য উত্তোলিত।

এইবার জাতির আর এক মহাসমস্যা উপস্থিত। মায়ের পূজার বিধান নিয়ে, ক্রম নিয়েই এই বিবাদ। কিন্তু যখন আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি শান্তির সময়ের মতো নির্বিবাদে এ পূজা যখন সাঙ্গ করতে পারব না, শত্রু যখন সহস্র বাণে দেহ ক্ষত-বিক্ষত করছে, সেই অবস্থাতেই যখন আমাদের পূজা সাঙ্গ করতে হবে, তখন মায়ের নিকট শান্তিতে বসে মায়ের শ্রীঅঙ্গে পুষ্প চন্দন সেবা করবার অবসর কই?

উদ্দেশ্য যদি এক হয়, তবে যার যেখানে সুবিধা সেখান থেকেই বুরোক্রেসির বিষদাঁত ভাঙবার ব্যবস্থা করতে হবে। মায়ের এখন ভুবনেশ্বরী মূর্তি নয়, ভারতমাতা এখন মৃত্যুরূপা কালী। তারই উপর যখন অত্যাচার তখন নিজের সাধনার কথা জাহান্নামে দিয়ে আগে তাকেই রক্ষা করতে হবে, আর অত্যাচারীকে বহু দূরে রাখবার জন্যে আলোয় আঁধারে, সদরে অন্দরে সর্বথা ঢুকে তার যতরকম বাঁধনের চাবিকাঠি চুরির

সিঁদকাঠি আছে সব কেড়ে নিতে পারা যায় যেমন করে, ফাঁকে পেলেই তার চামড়া কতখানি শীঘ্র তুলে নেওয়া যায়, তার অত্যাচার থেকে নিরীহ জনসাধারণকে বাঁচাতে হলে যত পথ পাওয়া যায়, সে পথ যত দুর্গমই হোক, তার একটাও হাতছাড়া কেমন করে না হয়, তার সকল ফন্দি করে ফাঁসিয়ে দেওয়া যায়—যাঁরা কথার লোক নন, কাজের লোক তাঁরা তাই ভাবুন। ওদের শিবিরের যেখানে খুশি প্রবেশ করে ছত্রভঙ্গ করে দিন, কথার আবার ভাব কি? ও তো হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, অত্যাচারীর খাবারের কতকখানি টেনে নিয়ে এলে তার ভুড়ি পাতলা করা যায়, আমার ঘাড়ের উপর থেকে কোনো পাঁকের ভিতর কোনো কাঁটাবনে, কোনো আঁধার রাত্রে তাকে দুটো ঠাসা, দুটো ঘুষি এবং অন্নজল বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাই এখন শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, গমনে, দানে, ধ্যানে, পূজায়, পার্বণে, বিবাদে, শ্মশানে একমাত্র ভাববার কথা।

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে একটু ভাল করে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দুটি রূপ। এক রূপে সে শেলির Skylark-এর মতো, মিল্টনের Birds of Paradise-এর মতো এই ধূলি-মলিন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না ; কেবলি ঊর্ধ্বে—আরো ঊর্ধ্বে উঠে স্বপনলোকের গান শোনায়। এইখানে সে স্বপন-বিহারী।

আর এক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে—অন্ধকার নিশীথে, ভয়ের রাতে বিহ্বল শিশু যেমন করে তার মাকে জড়িয়ে থাকে—তরুলতা যেমন করে সহস্র শিকড় দিয়ে ধরণী-মাতাকে ধরে থাকে—তেমনি করে। এইখানে সে মাটির দুলাল।

ধূলি-মলিন পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে, স্বর্গকে চায় না, তা নয়। তবে সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলে সুন্দরের স্বর্গলোকে যেতে চায় না। সে বলে : স্বর্গ যদি থাকেই তবে তাকে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধূলির ধরাতে নামিয়ে আনব। আমাদের পৃথিবীই চিরদিন তার দাসীপনা করেছে, আজ তাকেই এনে আমাদের মাটির মায়ের দাসী করব। এর এ-ঔদ্ধত্যে সুর লোকের দেবতারা হাসেন। বলেন : অসুরের অহঙ্কার, কুৎসিতের মাতলামি ! এরাও চোখ পাকিয়ে বলে : আভিজাত্যের আস্ফালন, লোভীর নীচতা !

গত মহাযুদ্ধের পরের মহাযুদ্ধের আরম্ভ এইখান থেকেই।

ঊর্ধ্বলোকের দেবতারা ভ্রূকুটি হেনে বলেন : দৈত্যের এ-ঔদ্ধত্য কোনো-কালেই টেকেনি !

নিচের দৈত্য-শিশু ঘুষি পাকিয়ে বলে : কেন যে টেকেনি তার কৈফিয়তই তো চাই, দেবতা ! আমরা তো তারই আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই।

দুই দিকেই বড় বড় রথী-মহারথী। একদিকে নোগুচি, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি dreamers স্বপ্নচারী, আর একদিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ড শ, বেনাভাঁতে প্রভৃতি।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই দুটো রূপই বড় হয়ে উঠেছে।

এর অন্যরূপও যে নেই, তা নয়। এই দুই extreme-এর মাঝে যে, সে এই মাটির মায়ের কোলে শুয়ে স্বর্গের কাহিনী শোনে। রূপকথার বন্দিনী রাজকুমারীর দুঃখে সে অশ্রু বিসর্জন করে, পক্ষীরাজে চড়ে তাকে মুক্তি দেবার ব্যাকুলতায় সে পাগল হয়ে ওঠে। সে তার মাটির মাকে ভালবাসে, তাই বলে স্বর্গের বিরুদ্ধে অভিযানও করে না। এই শিশু মনে করে—স্বর্গ এই পৃথিবীর সতিন নয়, সে তার মাসিমা। তবে সে তার মায়ের মতো দুঃখিনী নয়, সে রাজরানি, বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী। সে জানে, তারই আত্মীয় স্বর্গের দেবতাদের কোনো দুঃখ নেই, তারা সর্বপ্রকারে সুখী—কিন্তু তাই বলে তার উপর তার আক্রোশও নেই। সে তার বেদনার গানখানি একলা ঘরে বসে বসে গায়—তার দুঃখিনী মাকে শোনায়।—তার আর ভাইদের মতো, তার অশ্রুজলে কর্দমাক্ত হয় যে মাটি, সেই মাটিকে তাল পাকিয়ে উদ্ধত রোষে স্বর্গের দিকে ছোঁড়ে না।

এঁদের দলে—লিওনিদ আঁদ্রিভ, ক্লুট হামসুন, ওয়াদিশল, রেমঁদ প্রভৃতি।

বার্নার্ড শ, আনাতোল ফ্রাঁস, বেনাভাঁতের মতো হলাহল এঁরাও পান করেছেন, এঁরাও নীলকণ্ঠ, তবে সে হলাহল পান করে এঁরা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহল উদ্গার করেননি।

যাঁরা ধ্বংসব্রতী—তাঁরা ভৃগুর মতো বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন : এ দুঃখ, এ বেদনার একটা কিনারা হোক। এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্ত-মাখা রিভোলিউশন দিয়ে। এর খোল-নলচে দুই বদলে একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করব। আমাদের সাধনা দিয়ে নতুন সৃষ্টি নতুন স্রষ্টা সৃজন করব।

স্বপ্নচারীদের Keats বলেন :

A thing of beauty is a joy for ever. (ENDYMION)

Beauty is truth, truth beauty.

প্রত্যুত্তরে মাটির মানুষ Whitman বলেন :

Not physiognomy alone—

Of physiology from top to toe I sing,

The modern man I sing.

গত Great War-এর ঢেউ আরব-সাগরের তীর অতিক্রম করেনি, কিন্তু এবারকার এই idea-জগতের Great War বিশ্বের সকল দেশের সবখানে শুরু হয়ে গেছে।

দশ মুণ্ড দিয়ে খেয়ে বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হলো না, সেই capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ষ-সেনারা এদের বলে হনুমান। এই লোভ-রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরই ভোগ্যা, ধরার মেয়ে প্রসারপাইন যমরাজ প্লুটোরই হবে সেবিকা। সীতার উদ্ধারে যায় যে তথাকথিত হনুমান, রক্ষ-সেনা

দেয় তার লেজে আগুন লাগিয়ে। তথাকথিত হনুমানও বলে, ল্যাজে যদি আগুনই লাগালি, আমার হাতমুখ যদি পোড়েই—তবে তোর স্বর্ণলঙ্কাও পোড়াব—বলেই দেয় লম্ফ।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে এবং সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কাও পুড়ছে—এ আপনারা যে-কেউ দিব্যচক্ষে দেখছেন বোধ হয়। না দেখতে পেলে চশমাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেই দেখতে পাবেন। দুরবিনের দরকার হবে না।

রামায়ণে উল্লেখ আছে, সীতাকে উদ্ধার করার পুণ্যবলে মুখপোড়া হনুমান অমর হয়ে গেছে। সে আজো পূজা পাচ্ছে ভারতের ঘরে ঘরে। আজকের লাঞ্ছনার আগুনে যে দুঃসাহসীদের মুখ পুড়ছে—তারাও ভবিষ্যতে অমর হবে না, পুজো পাবে না—এ কথা কে বলবে?

এইবার কিন্তু আপনাদের সকলেরই আমার সাথে লঙ্কা ডিঙাতে হবে। অবশ্য, বড় বড় পেট যাদের, তাঁদের বলছিনে, হয়তো তাতে করে তাঁদের মাথা হেঁটই হবে।...

এই সাগর ডিঙাবার পরই আমাদের চোখে সর্বপ্রথম পড়ে 14th December—১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের 14th December—এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি Merezhkovsky-র বেদনা-চিৎকার '14th December!' এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি বর্বর রুশ-সম্রাট নিকোলায়ের দণ্ডাজ্ঞায় সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত শতাধিক প্রতিভাদীপ্ত কবির ও সাহিত্যিকের মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস্। এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পুশকিনের ফাঁসির রজ্জুতে লটকানো মৃত্যুপাণ্ডুর মূর্তি।*

এই নির্বাসনের সাইবেরিয়ায় জন্ম নিল দস্তয়ভস্কির 'Crime and Punishment'। রাস্কলনিকভ যেন দস্তয়ভস্কিরই দুঃখের উন্মাদ মূর্তি, সোনিয়া যেন ধর্ষিতা রাশিয়ারই প্রতিমূর্তি। যেদিন রাস্কলনিকভ এই বহু-পরিচর্যারতা সোনিয়ার পায়ের তলায় পড়ে বলল, 'I bow down not to thee, but to suffering humanity in you!' সেদিন সমস্ত ধরণী বিস্ময়ে-ব্যথায় শিউরে উঠল। নিখিল-মানবের মনে উৎপীড়িতের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ফেনিয়ে উঠল। টলস্টয়ের God এবং Religion কোথায় ভেসে গেল এই বেদনার মহাপ্লাবনে। সে মহাপ্লাবনে Noah-র তরণীর মতো ভাসতে লাগল সৃষ্টি—প্লাবন-শেষ নতুন দিনের প্রতীক্ষায়।

তারপর এল এই মহাপ্লাবনের ওপর তুফানের মতো—ভয়াবহ সাইক্লোনের মতো বেগে ম্যাক্সিম গোর্কি। চেকভের নাট্যমঞ্চ ভেঙে পড়ল, সে বিস্ময়ে বেরিয়ে এসে এই

---

* সেন্ট পিটার্সবুর্গে Decembrists Revolt হয়েছিল ; সেই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতি পুশকিন সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, এমনকি Decembrist Welfare Society-র গুপ্তসভায়ও তিনি যোগ দিতেন, এসব তথ্য অধুনা জানা গেছে। কিন্তু তিনি 'ফাঁসির রজ্জুতে' প্রাণ দিয়েছিলেন, এ-তথ্য ঠিক নয়। রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আলেকজান্দার পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭) কিঞ্চিদধিক ৩৭ বছর বয়সে তাঁর স্ত্রীর আপন ভগ্নিপতি ব্যারন জর্জেস দ্য আঁথেস (Baron Georges d' Anthes)-এর সঙ্গে দ্বৈতদ্বন্দ্বে (duel-এ) পিস্তলের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান।—সম্পাদক।

ঝড়ের বন্ধুকে অভিবাদন করলে। বেদনার ঋষি দস্তয়ভস্কি বললে : তোমার সৃষ্টির জন্যেই আমার এ তপস্যা। চালাও পরশু, হানো ত্রিশূল! বৃদ্ধ ঋষি টলস্টয় কেঁপে উঠলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলে উঠলেন : **That man has only one God and that is Satan!** কিন্তু এই তথাকথিত শয়তান অমর হয়ে গেল, ঋষির অভিশাপ তাকে স্পর্শও করতে পারলে না।

গোর্কি বললেন : দুঃখ-বেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত হব না—আমরা এর প্রতিশোধ নেব। রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীকে শুচি করব।

'লক্ষ কণ্ঠে গুরুজির জয়' আরাবে বাসুকির ফণা দোল খেয়ে উঠল। নির্জিতের বিক্ষুব্ধ অভিযানের পীড়নে পায়ের তলার পৃথিবী চাকার নিচের ফণিনীর মতো মোচড় খেয়ে উঠল।

দূর সিন্ধুতীরে বসে ঋষি কার্ল মার্কস যে মারণমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে-লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলে। জার গেল—জারের রাজ্য গেল—ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ধ্বংস-ক্লান্ত পরশুরামের মতো গোর্কি আজ ক্লান্ত-শ্রান্ত—হয়তো বা নব-রামের আবির্ভাবে বিতাড়িতও। কিন্তু তার প্রভাব আজ রুশিয়ার আকাশে বাতাসে।

কার্ল মার্কসের ইকনমিকস-এর অঙ্ক এই জাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অঙ্কলক্ষ্মী হয়ে উঠেছে। পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে। ভোরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মতো এর করুণ মাধুরী বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছে।

গোর্কির পরে যে সব কবি-লেখক এসেছেন, তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার কিছু আছে কি-না তা আজও বলা দুষ্কর।

রাশিয়ার পরেই আগে স্ক্যান্ডিনেভিয়া।—আইডিয়ার জগতে বিপ্লবের অগ্রদূত বলে দাবি রাশিয়া যেমন করে—তেমনি নরওয়েও করে। ফ্রান্স-জার্মানিও এ অধিকারের সবটুকুই পেতে দাবি করে।

আজকের নরওয়ের ক্নুট হামসুন, যোহান বোয়ার—শুধু নরওয়ের কথাই বা কেন বলি, আজকের বিশ্বের জীবিত ছোট-বড় সব Realistic লেখকই বুঝি বা ইবসেনের মানসপুত্র। হামসুন, বোয়ারের প্রত্যেকেই অর্ধেক dreamer, অর্ধেক ঔপন্যাসিক। বোয়ারের Great Hunger-এর Swan যেন ভারতেরই উপনিষদের আনন্দ। তাঁর **The Prisoner Who Sang**-এর নায়ক যেন পাপেপুণ্যে অবিশ্বাসী নির্বিকার উপনিষদের সচ্চিদানন্দ। হামসুনের Growth of the Soil-এর Pan-এর ছত্রে ছত্রে যেন বেদের ঋষিদের মতো স্তবের আকুতি। যে করুণ-সুন্দর দুঃখের, যে পীড়িত মানবাত্মার বেদনা এঁদের লেখায় সিন্ধুতীরের উইলো তরুর মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—তার তুলনা কোনো কালের কোনো সাহিত্যেই নেই।

এই দুঃসহ বেদনা আমরা লাঘব করি লেগারলফের রূপকথা পড়ে—মাতৃহারা শিশু যেমন করে তার দিদিমার কোলে শুয়ে রূপকথার আড়ালে নিজের দুঃখকে লুকাতে চায়, তেমনি।

রাশিয়া দিয়েছে Revolution-এর মর্মান্তিক বেদনার অসহ্য জ্বালা ; স্ক্যান্ডিনেভিয়া দিয়েছে অরুন্তুদ বেদনার অসহায় দীর্ঘশ্বাস। রাশিয়া দিয়েছে হাতে রক্ত তরবারি ; নরওয়ে দিয়েছে দুচোখে চোখভরা জল। রাশিয়া বলে এ-বেদনাকে পুরুষ-শক্তিতে অতিক্রম করব, ভুজবলে ভাঙব এ-দুঃখের অন্ধ কারা। নরওয়ে বলে, প্রার্থনা করো ! ঊর্ধ্বে আঁখি তোলো ! সেথায় সুন্দর দেবতা চিরজাগ্রত—তিনি কখনো তাঁর এ অপমান সহ্য করবেন না !

এই প্রার্থনার সব স্নিগ্ধ প্রশান্তিটুকু উবে যায় হঠাৎ কোনো অবিশ্বাসীর নির্মম অট্টহাস্যে। সে যেন কেবলি বিদ্রূপ করে। চোখের জলকে তারা মুখের বিদ্রূপ-হাসিতে পরিণত করেছে। মেঘের জল শিলাবৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। পিছন ফিরে দেখি, চার্বাকের মতো, জাবালির মতো, দুর্বাসার মতো দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি-কুটিল বার্নার্ড শ, আনাতোল ফ্রাঁস, জেসিতো বেনাভাঁতে। তাঁদের পেছন থেকে উঁকি দেয় ফ্রয়েড। শ বলেন : Love-টাভ কিছু নয়—ও হচ্ছে মা হবার instient মাত্র, ওর মূলে Sex। আনাতোল ফ্রাঁস বলেন : কি হে ছোকরারা, খুব তো লিখছ আজকাল। বলি, ব্যালজ্যাক-জোলা পড়েছ ?

বেনাভাঁতেও হাসেন, কিন্তু এ বেচারা ওঁদের মধ্যেই একটু ভীরু। হাসি লুকাতে গিয়ে কেঁদে ফেলে Leonardoর মুখ দিয়ে বলে : 'বন্ধু ! যে জীবন মরে ভূত হয়ে গেল—তাকে ভুলতে হলে ভালো করে কবরের মাটি চাপা দিতে হয়। মানুষের যতক্ষণ আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে ততক্ষণ সে কাঁদে, কিন্তু সব আশা যখন ফুরিয়ে যায়—সে যদি প্রাণ খুলে হেসে আকাশ ফাটিয়ে না দিতে পারে তবে তার মরাই মঙ্গল।'

তাঁর মতে হয়তো আমাদের তাজমহল—শাহজাহানের মোমতাজকে ভালো করে কবর দিয়ে, ভালো করে ভুলবারই চেষ্টা।

বেনাভাঁতে হাসে, সে নির্মম ; কিন্তু সে বার্নার্ড শ'র মতো অবিশ্বাসী নয়।

এরি মাঝে আবার দুটি শান্ত লোক চুপ করে কৃষাণ-জীবনের সহজ সুখ-দুঃখের কথা বলে যাচ্ছে—তাদের একজন ওয়াদিশল রেমন্ট—পোলিশ, আর একজন গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা—ইতালিয়ান।

কিন্তু গল্প শোনা হয় না। হঠাৎ চমকে উঠে শুনি—আবার যুদ্ধ-বাজনা বাজছে—এ যুদ্ধ-বাদ্য বহু শতাব্দীর পশ্চাতের। দেখি তালে তালে পা ফেলে আসছে—সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত সেনা। তাদের অগ্রে ইতালির দ্যু-অননৎসিও, কিপলিং প্রভৃতি। পতাকা ধরে মুসোলিনি এবং তার কৃষ্ণ-সেনা।

ক্লান্ত হয়ে নিশীথের অন্ধকারে ঢুলে পড়ি। হঠাৎ শুনি দূরাগত বাঁশির ধ্বনির মতো শ্রেষ্ঠ স্বপনচারী নোগুচির গভীর অতলতার বাণী—'The sound of the bell that leaves the bell itself.' তারপরেই সে বলে : 'আমি গান শোনার জন্য তোমার গান শুনি না। ওগো বন্ধু, তোমার গান সমাপ্তির যে বিরাট স্তব্ধতা আনে তারি অতলতায় ডুব দেওয়ার জন্য আমার এ গান শোনা।' শুনতে শুনতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে। ধুলার পৃথিবীতে সুন্দরের স্তবগান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের নতুন রবির আশায় ! স্বপ্নে

শুনি—পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্রচালকের বাঁশি,—তুরস্কের নেকাব-পরা মেয়ের মতো দেহ।

তখনো চারপাশে কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির হোলি-খেলা চলে। আমি স্বপ্নের ঘোরেই বলে উঠি—'Thou wast not born for death, immortal bird!'

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ

তখন আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজ-কয়েদি। অপরাধ, ছেলে খাওয়ার ঘটা দেখে রাজার মাকে একদিন রাগের চোটে ডাইনি বলে ফেলেছিলাম।...

এরি মধ্যে একদিন এ্যাসিস্ট্যান্ট জেলার এসে খবর দিলেন, 'আবার কি মশাই, আপনি তো নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেলেন, আপনাকে রবিঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গ করেছেন।'

আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন আরো দু-একটি কাব্য-বাতিকগ্রস্ত রাজকয়েদি। আমার চেয়েও বেশি হেসেছিলেন সেদিন তাঁরা। আনন্দে নয়, যা নয় তাই শুনে।

কিন্তু ঐ আজগুবি গল্পও সত্য হয়ে গেল। বিশ্বকবি সত্যিসত্যিই আমার ললাটে 'অলক্ষণের তিলক-রেখা' এঁকে দিলেন।

অলক্ষণের তিলক-রেখাই বটে, কারণ, এর পর থেকে আমার অতি অন্তরঙ্গ রাজবন্দি বন্ধুরাও আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। যাঁরা এতদিন আমার এক লেখাকে দশবার করে প্রশংসা করেছেন, তাঁরাই পরে সেই লেখার পনেরোবার করে নিন্দা করলেন। আমার হয়ে গেল 'বরে শাপ!'

জেলের ভিতর থেকেই শুনতে পেলাম, বাইরেও একটা বিপুল ঈর্ষা-সিন্ধু ফেনায়িত হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস হলো না। বিশেষ করে যখন শুনলাম, আমারই অগ্রজ-প্রতিম কোনো কবি-বন্ধু, সেই সিন্ধু-মন্থনের অসুর-পক্ষ 'লীড' করছেন। আমার প্রতি তাঁর অফুরন্ত স্নেহ, অপরিসীম ভালবাসার কথা শুধু যে আমরা দুজনেই জানতাম, তা নয়, দেশের সকলেই জানত তাঁর গদ্যে-পদ্যে কীর্তিত আমার মহিমা-গানের ঘটা দেখে।

সত্য-সুন্দরের পূজারী বলে যাঁরা হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে বেড়ান, তাঁদের মনও ঈর্ষায় কালো হয়ে ওঠে,—শুনলে আর দুঃখ রাখবার জায়গা থাকে না।

এ-খবর শুনে চোখের জল আমার চোখেই শুকিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম শুধু আমি, বাইরের এই লাভে অন্তরের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল আমার! মনে মনে কেঁদে বললাম, 'হায় গুরুদেব! কেন আমার এত বড় ক্ষতিটা করলে?'...

বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয়-মন দিয়ে, যেমন করে ভক্ত তার ইষ্টদেবতাকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ-ফুল-চন্দন দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোকে কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

এমনকি আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্রবিদ্বেষী কোনো একজনের মাথার চাঁদিতে আজো অক্ষয় হয়ে লেখা আছে। এবং এই ভক্তির বিচারের ভার একদিন আদালতের ধর্মাধিকরণের ওপরেই পড়েছিল।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় কবি ও কথাশিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একদিন কবির সামনেই এ-কথা ফাঁস করে দিলেন। কবি হেসে বললেন, 'যাক, আমার আর ভয় নেই তাহলে!'

তারপর কতদিন দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে। নিজের লেখা দুচারটে কবিতা-গানও শুনিয়েছি ... অবশ্য কবির অনুরোধেই। এবং আমার অতি সৌভাগ্যবশত তার অতি-প্রশংসা লাভও করেছি কবির কাছ থেকে। সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কোনোদিন এতটুকু প্রাণের দৈন্য বা মন-রাখা ভালো বলবার চেষ্টা দেখিনি।

সংকোচে দূরে গিয়ে বসলে সস্নেহে কাছে ডেকে পাঠিয়েছেন। কতদিন তাঁর তপোবনে গিয়ে থাকবার কথা বলেছেন। হতভাগা আমি, তাঁর পায়ের তলায় বসে মন্ত্র গ্রহণের অবসর করে উঠতে পারলাম না, বনের মোষ তাড়িয়েই দিন গেল।

এই নিয়ে কতদিন তিনি আমায় কতভাবে অনুযোগ করেছেন—'তুমি তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছ—তোমাকে জনসাধারণ একেবারে খানায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে'—ইত্যাদি।

আমি দেখছি, এ-গৌরবে আমার মুখ যত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো নাম-করা কবির মুখে কে যেন তত কালি ঢেলে দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরাই এমনি করে শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। আজ তিন চার বছর ধরে এই 'শুভানুধ্যায়ী'রা গালি-গালাজ করেছেন আমায়, তবু তাঁদের মনের ঝাল বা প্রাণের খেদ মিটল না। বাপরে বাপ! মানুষের গাল দেবার ভাষা ও তার এত করতবও থাকতে পারে, এ আমার জানা ছিল না।

ফি শনিবারে চিঠি! এবং তাতে সে কী গাড়োয়ানি রসিকতা, আর সে মেছোহাটা থেকে টুকে-আনা গালি! এই গালির গালিচাতে বোধ হয় আমি এ-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ।

বাংলায় 'রেকর্ড' হয়ে রইল আমায়-দেওয়া এই গালির স্তূপ। কোথায় লাগে ধাপার মাঠ। ফি হপ্তায় মেল (ধাপা-মেল) বোঝাই। কিন্তু এত নিন্দাও সয়েছিল। এতদিন তবু সান্ত্বনা ছিল যে, এ হচ্ছে তন্তুবায়ের বলীবর্দ ক্রয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। বাবা, তুই নখদন্তহীন নিরামিষাশী কবি, তোর কেন এ ঘোড়া-রোগ—এ স্বদেশপ্রেমের বাই উঠল? কোথায় তুই হাঁ করে খাবি গুলবদনীর গুলিস্তানে মলয়-হাওয়া, দেখবি ফুলের হাই-তোলা, গাইবি, 'আয়লো অলি কুসুমকলি' গান,—তা না করে দিতে গেলি রাজার পেছনে খোঁচা! গেলি জেলে, টানলি ঘানি, করলি প্রায়োপবেশন, পরলি শিকল—বেড়ি, ডাণ্ডাবেড়ি, বইগুলোকে একধার থেকে করাতে লাগলি বাজেয়াপ্ত, এ কোনরকম রসিকতা তোর? কেনই বা এ হ্যাঙ্গামা-হুজ্জুৎ?

হঠাৎ একদিন দেখি ঝড় উঠেছে! সাহিত্যের বেণু-বনে। এবং দেখতে দেখতে সুরের বাঁশি অসুরের কোঁৎকা হয়ে উঠেছে! ছুট ছুট! যত মোলায়েম করেই বেণু-বন বলি না কেন, তাতে ঝড় উঠলে যে তা চিরন্তন বাঁশবনই হয়ে ওঠে তা কোনো পাষণ্ড অবিশ্বাস করবে?

বেচারি তরুণ সাহিত্য! যেন বালক অভিমন্যুকে মারতে সপ্তমহারথীর সমাবেশ। বাইরে ছেলেমেয়ের ভিড় জমে গেল। ঘন ঘন হাততালি! বলে, 'এই! বাঁশ-বাজি দেখতে যাবি, দৌড়ে আয়!' কিন্তু শুধুই কি সপ্তমহারথীর মার? তাঁদের পেছনের পদাতিকগুলি যে আরো ভীষণ। ধুলো-কাদা-গোবর-মাটি—কোনো রুচির বাচ-বিচার নাই, বেপরোয়া ছুঁড়ে চলেছে!

মহারথীদের মধ্যে অমর্যাদা নেই, কিন্তু বাইরে থেকে আসা ঐ ভাড়াটে গুণ্ডাগুলোর নোংরামিতে সাহিত্যের বেণু-বন যে পুকুর-পাড়ের বাঁশবাগান হয়ে উঠল।

পুলিশের জুলুম আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওদের জুলুমের তবু একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জুলুম করতে শুরু করে, তার আর পারাপার নেই। এরা তখন হয়ে ওঠে টিকটিকি পুলিশের চেয়েও ক্রূর, অভদ্র। যেন চাক-ভাঙা ভীমরুল। জলে ডুবেও নিষ্কৃতি নেই, সেখানে গিয়েও দংশন করবে।

পলিটিক্সের পাঁকের ভয়ে পালিয়ে গেলাম নাগালের বাইরে। মনে করলাম, যাক, এতদিনে একবার প্রাণভরে সাহিত্যের নির্মল বায়ু সেবন করে অতীতের গ্লানি কাটিয়ে উঠব। ও বাবা! সাহিত্যের আসর যে পলিটিক্যাল আখড়ার চেয়েও নোংরা, তা কে জানত!

কপাল! কপাল! পালিয়েও কি পার আছে? হঠাৎ একদিন সপ্তরথীর সপ্ত-প্রহরণে চকিত হয়ে উঠলাম। ব্যাপার কি?

জানতে পারলাম, আমার অপরাধ আমি তরুণ। তরুণেরা নাকি আমায় ভালবাসে, তারা আমার লেখার ভক্ত!

সভয়ে প্রশ্ন করলাম, আজ্ঞে, এতে আমার অপরাধটা কিসের হলো?—বহু কণ্ঠের হুংকার উঠল, ঐটেই তোমার অপরাধ, তুমি তরুণ এবং তরুণেরা তোমায় নিয়ে নাচে।

বললাম, আপাতত আপনাদের ভয়ে আজই তো বুড়ো হয়ে যেতে পারছিনে। ওর জন্য দু-দশ বছর মার খেয়েই অপেক্ষা করতে হবে। আর, যারা আমায় নিয়ে নাচে, আপনারাও তাদের নাচিয়ে ছেড়ে দিন। গোল চুকে যাবে। আমায় নিয়ে কেন টানাটানি?

আবার নেপথ্যে শোনা গেল,—তুমি এই জ্যাঠা অভিমন্যুর পৃষ্ঠারক্ষী। তোমাকে মারতে পারলেই একে কবুল করতে দেরি লাগবে না।

দেখাই যাক ...

এতদিন আমি উপেক্ষাবশতই এ ধোঁয়া-বাণের প্রত্যুত্তরে ধোঁয়া ছাড়িনি—না উনুনের, না সিগারেটের। ভেবেছিলাম সম্রাটে-সম্রাটে যুদ্ধ, দূরে দাঁড়িয়ে থাকাই ভালো। কিন্তু হাতিতে-হাতিতে লড়াই হলেও নলখাগড়ার নিস্তার নাই দেখছি। কাজেই, আমাদেরও এবার আত্মরক্ষা করতে হবে। পড়ে পড়ে মার খাওয়ায় কোনো পৌরুষ নেই..।

পলিটিক্সের পক্ষকে যাঁরা এতদিন ঘৃণা করে এসেছেন, বেণু-বনের বাঁশের প্রতি তাঁদের এই আকস্মিক আসক্তি দেখে আমারই লজ্জা করছে—বাইরের লোক কি বলছে তা না-ই বললাম।

এ বাঁশ ছোঁড়ারও তারিফ করতে হবে। কোনো বিশেষ একজনের শির রক্ষা করে না ছুঁড়ে এঁরা ছুঁড়ছেন একেবারে দল লক্ষ্য করে। কারণ তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার লজ্জা নেই। বীর বটে। এতদিন তাই পরাস্ত মেনেই চুপ করে ছিলাম। কিন্তু ঐ চুপ করে থাকি বলেই ও-পক্ষ মনে করেন, আমরা জিতে গেলাম। তাই এবার মাথা বেছে বেছেই বাঁশ ছেঁড়া হচ্ছে—বাণনয়!

অবশ্য, সে-বাঁশে বাঁশির মতো গোটাকতক ফুটো করে সুর ফোটাবার আয়াসেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তবু তার খোঁচা আর স্থূলত্বই বলে, ও বাঁশি নয়—বাঁশ।

বীণাই শোভা পায় যাঁর হাতে, তাঁকেও লাঠি ঘুরাতে দেখলে, দুঃখও হয়, হাসিও পায়। পালোয়ানি মাতামাতিতে কে যে কম যান, তা তো বলা দুষ্কর ...

আজকের 'বাঙ্গলার কথা'য় দেখলাম, যিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের পক্ষ হয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে লাঞ্ছিত করবার সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন, আমাদের উভয় পক্ষের পূজ্য পিতামহ ভীষ্ম-সম সেই মহারথী কবিগুরু এই অভিমন্যু-বধে সায় দিয়েছেন। মহাভারতের ভীষ্ম এই অন্যায় যুদ্ধে সায় দেননি, বৃহত্তর ভারতের ভীষ্ম সায় দিয়েছেন—এইটেই এ-যুগের পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক।

এই অভিমন্যুর রক্ষী মনে করে কবিগুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় রক্তকে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি।

কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি তো নিজেও টুপি-পায়জামা পরেন, অথচ, আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হয়ে উঠি কেন, বুঝতে পারিনে।

এই আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন।

আমি একটা জিনিস কিছুদিন থেকে লক্ষ করে আসছি। সম্ভ্রান্ত হিন্দু-বংশের অনেকেই পায়জামা-শেরওয়ানি-টুপি ব্যবহার করেন, এমনকি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তাতে তাঁদের কেউ বিদ্রূপ করে না, তাঁদের ড্রেসের নাম হয়ে যায় তখন 'ওরিয়েন্টাল'। কিন্তু ওইগুলোই মুসলমানেরা পরলে তারা হয়ে যায় 'মিয়া সাহেব'। মৌলানা সাহেব আর নারদ মুনির দাড়ির প্রতিযোগিতা হলে কে যে হারবেন বলা মুশকিল; তবু ও নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপের আর অন্ত নেই।

আমি তো টুপি-পায়জামা-শেরওয়ানি-দাড়িকে বর্জন করে চলেছি শুধু ঐ 'মিয়া সাহেব' বিদ্রূপের ভয়েই—তবু নিস্তার নেই।

এইবার থেকে আদালতকে নাহয় বিচারালয় বলব, কিন্তু নাজির-পেশকার-উকিল-মোক্তারকে কী বলব?

কবিগুরুর চিরন্তনের দোহাই নিতান্ত অচল। তিনি ইটালিকে উদ্দেশ্য করে এক কবিতা লিখেছেন। তাতে—'উতারো ঘোমটা' তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি। 'ঘোমটা

খোলা' শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। উতারো ঘোমটা আমি লিখলে হয়তো সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধীই হতাম। কিন্তু 'উতারো' কথাটা যে জাতেরই হোক, ওতে এক অপূর্ব সংগীত ও শ্রীর উদ্বোধন হয়েছে ও জায়গাটায়, তা তো কেউ অস্বীকার করবে না। ওই একটু ভালো শোনাবার লোভেই ঐ একটি ভিনদেশী কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করি। কবিগুরুও কতদিন আলাপ-আলোচনায় এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন।

আজ আমাদেরও মনে হচ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চিরচেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পিছনের বৈয়াকরণ পণ্ডিত এসব বলাচ্ছে তাঁকে।

'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানি বা বলশেভিকি রঙ দেওয়ার জন্য নয়। হয়তো কবি ও-দুটোর একটারও রঙ আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।

আমি শুধু 'খুন' নয়—বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্বকাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানি ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ও-ঢং-এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।

বাংলা কাব্য-লক্ষ্মীকে দুটো ইরানি 'জেওর' পরালে তার জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও খুবসুরতই দেখায়।

আজকের কলা-লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলংকারই তো মুসলমানি ঢং-এর। বাইরের এ ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল শিল্পীই স্বীকার করেন। পণ্ডিত মালবিয়া স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন।

তাছাড়া যে 'খুনে'র জন্য কবি-গুরু রাগ করেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের কথায় 'কালার-বক্সে' (Colour box-এ) এবং তা 'খুন হওয়া' ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপারেই নয়। হৃদয়েরও খুন-খারাবি হতে দেখি আজো। এবং তা শুধু মুসলমান পাড়া লেনেই হয় না।

আমার একটা গান আছে—

'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।'

এই গানটি সেদিন কবিগুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম এবং এতেই হয়তো তাঁর ও-কথার উল্লেখ। তিনি রক্তের পক্ষপাতী। অর্থাৎ ও লাইনটাকে—'উদিবে সে রবি মোদেরই রক্তে রাঙিয়া পুনর্বার', ও করা চলত। চলত, কিন্তু ওতে ওর অর্ধেক ফোর্স কমে যেত। আমি যেখানে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ওই রকম ন্যাশনাল সংগীতে বা রুদ্ররসের কবিতায়। যেখানে 'রক্তধারা' লিখবার, সেখানে জোর করে 'খুনধারা' লিখি নাই। তাই বলে 'রক্তখারাবি'ও লিখি নাই, হয় 'রক্তারক্তি' নাহয় 'খুন-খারাবি' লিখেছি।

কবিগুরু মনে করেন, রক্তের মানেটা আরো ব্যাপক। ওটা প্রেমের কবিতাতেও চলে। চলে, কিন্তু ওতে 'রাগ' মেশাতে হয়। প্রিয়ার গালে যেমন 'খুন' ফোটে না তেমনি 'রক্ত'ও ফোটে না—নেহাৎ দাঁত না ফুটালে। প্রিয়ার সাথে 'খুনখুনি' খেলি না, কিন্তু 'খুনসুড়ি' হয়তো করি।

কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্য-লক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর চাপকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গির সুর শুনতে, ফুলবনের কোকিলের গানের বিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুর।

এতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্যসভায় ভিড় না করে হিন্দুসভারই মেম্বার হন গিয়ে।

যে কবিগুরু অভিধান ছাড়া নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করে ভাবীকালের জন্য আরো তিনটে অভিধানের সঞ্চয় রেখে গেলেন, তাঁর এই নতুন শব্দভীতি দেখে বিস্মিত হই। মনে হয়, তাঁর এই আক্রোশের পেছনে অনেক কেহ এবং অনেক কিছু আছে। আরো মনে হয়, আমার শত্রু-সাহিত্যিকগণের অনেক দিনের অনেক মিথ্যা অভিযোগ জমে জমে ওর মনকে বিষিয়ে তুলেছে। নইলে আরবি-ফারসি শব্দের মোহ তো আমার আজকের নয় এবং কবিগুরুর সাথে আমার বা আমার কবিতার পরিচয়ও আজকের নয়। কই, এতদিন তো কোনো কথা উঠল না এ নিয়ে!

সবচেয়ে দুঃখ হয়, যখন দেখি কতকগুলো জোনাকিপোকা রবিলোকের বহু নিম্নে থেকেও কবিত্বের আস্ফালন করে। ভক্ত কি শুধু ওই নোংরা লোকগুলোই, যারা রাতদিন তাঁর কানের কাছে অন্যের কুৎসা গেয়ে তাঁর শান্ত-সুন্দর মনকে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ করে তুলছে? আর আমরা তাঁর কাছে ঘন ঘন যাইনে বলেই হয়ে গেলাম তাঁর শত্রু?

কবি-গুরুর কাছে প্রার্থনা, ঐ ধৃতরাষ্ট্রের সেনাপতিত্ব তিনি করুন, দুঃখ নাই। কিন্তু ওদের প্ররোচনায় আমাদের প্রতি অহেতুক সন্দেহ পোষণ করে যেন তাঁর মহিমাকে খর্ব না করেন।

সবচেয়ে কাছে যারা থাকে, দেব-মন্দিরের সেই পাণ্ডারাই দেবতার সবচেয়ে বড় ভক্ত নয়।

আরো একটা কথা। যেটা সম্বন্ধে কবিগুরুর একটা খোলা কথা শুনতে চাই।

ওঁর আমাদের উদ্দেশ্য করে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের এই দুঃখকে কৃত্রিম বলে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে, জানি। এবং এও জানি, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ ওই দারিদ্র্য ব্যতীত হয়তো আর সব দুঃখের সাথেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। তাই এতে ব্যথা পেলেও রাগ করিনি।

কী ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে আমাদের নতুন লেখকদের বেঁচে থাকতে হয়—লক্ষ্মীর কৃপায় কবিগুরুর তা জানা নেই। ভগবান করুন, তাঁকে যেন জানতে না হয়। কবিগুরু কোনোদিন আমাদের মতো সাহিত্যিকের

কুটিরে পদার্পণ করেননি—হয়তো তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ন হত না তাতে—নইলে দেখতে পেতেন, আমাদের জীবনযাত্রার দৈন্য কত ভীষণ! এই দীন-মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের একটেরে আত্মগোপন করে। দেশে দেশে প্রোপাগাণ্ডা করা তো দূরের কথা, বাড়ি ছেড়ে পথে দাঁড়াতে লজ্জা করে। কিছুতেই ছেঁড়া জামার তালিগুলোকে লুকাতে পা

সবচেয়ে কাছে যারা থাকে, দেব-মন্দিরের সেই পাণ্ডারাই দেবতার সবচেয়ে বড় ভক্ত নয়।

আরো একটা কথা। যেটা সম্বন্ধে কবিগুরুর একটা খোলা কথা শুনতে চাই।

ওঁর আমাদের উদ্দেশ্য করে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের এই দুঃখকে কৃত্রিম বলে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে, জানি। এবং এও জানি, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ ঐ দারিদ্র্য ব্যতীত হয়তো আর সব দুঃখের সাথেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। তাই এতে ব্যথা পেলেও রাগ করিনি।

কী ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে আমাদের নতুন লেখকদের বেঁচে থাকতে হয়—লক্ষ্মীর কৃপায় কবিগুরুর তা জানা নেই। ভগবান করুন, তাঁকে যেন জানতে না হয়। কবিগুরু কোনোদিন আমাদের মতো সাহিত্যিকের কুটিরে পদার্পণ করেননি—হয়তো তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ন হত না তাতে—নইলে দেখতে পেতেন, আমাদের জীবনযাত্রার দৈন্য কত ভীষণ! এই দীন-মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের একটেরে আত্মগোপন করে। দেশে দেশে প্রোপাগাণ্ডা করা তো দূরের কথা, বাড়ি ছেড়ে পথে দাঁড়াতে লজ্জা করে। কিছুতেই ছেঁড়া জামার তালিগুলোকে লুকাতে পারিনে। ভদ্র শিক্ষিতদের মাঝে বসে সর্বদাই মন খুঁতখুঁত করে, যেন কত বড় অপরাধ করে ফেলেছি। বাইরের দৈন্য-অভাব যত ভিতরে ভিতরে চাবকাতে থাকে, তত মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে।

কবি-গুরুর কাছেও শুধু ওই দীনতার লজ্জাতেই যেতে পারিনে। ভয় হয়, এ-লক্ষ্মীছাড়া মূর্তি দেখে তাঁর দারোয়ানেরাই ঐ সুর-সভায় প্রবেশ করতে দেবে না।

দীনভক্ত তীর্থযাত্রা করতে পারল না বলে দেবতা যদি অভিশাপ দেন, তাহলে এই পোড়াকপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া কীই বা বলবার আছে।

তাঁর কাছে নিবেদন, তিনি যত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করুন, তা হয় সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত আপনার এই দারিদ্র্য-যন্ত্রণাকে উপহাস করে যেন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দেন। শুধু ওই নির্মমতাটাই সইবে না।

কবিগুরুর চরণে,—ভক্তের আর একটি সশ্রদ্ধ আবেদন—যদি আমাদের দোষত্রুটি হয়েই থাকে, গুরুর অধিকারে সস্নেহে তা দেখিয়ে দিন, আমরা শ্রদ্ধাবনত শিরে তাকে মেনে নিব। কিন্তু যারা শুধু কুৎসিত বিদ্রূপ আর গালিগালাজই করতে শিখেছে তাঁকে তাদেরই বাহন হতে দেখলে আমাদের মাথা লজ্জায়, বেদনায় আপনি হেঁট হয়ে যায়। বিশ্বকবি-সম্রাটের আসন—রবিলোক—কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির বহু উর্ধ্বে।

কথাসাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র 'শনিবারের চিঠি' ওয়ালাদের কাছে আমায় গালিই দিন আর যাই করুন (জানি না ঐ সংবাদ সত্য কিনা) ওই দারিদ্র্যটুকুর অসম্মান তিনি

করতে পারেননি। অসহায় মানুষের দুঃখ-বেদনাকে তিনি এত বড় করে দেখেছেন বলেই আজ তাঁর আসন রবিলোকের কাছাকাছি গিয়ে উঠেছে।

একদিন কথাশিল্পী সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম যে, শরৎচন্দ্র তাঁর বই-এর সমস্ত আয় দিয়ে 'পথের কুকুর'দের জন্য একটা মঠ তৈরি করে যাবেন। খেতে না পেয়ে পথেপথে ঘুরে বেড়ায় হন্যে কুকুর, তারা আহার ও বাসস্থান পাবে ওই মঠে—ফ্রি অব চার্জ। শরৎচন্দ্র নাকি জানতে পেরেছেন, ঐ সমস্ত পথের কুকুর পূর্বজন্মে সাহিত্যিক ছিল, মরে কুকুর হয়েছে। শুনলাম ওই মর্মে নাকি উইলও হয়ে গেছে।

ওই গল্প শুনে আমি বারংবার শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলেছিলাম, 'শরৎ-দা সত্যিই একজন মহাপুরুষ।' সত্যিই আমরা সাহিত্যিকরা কুকুরের জাত। কুকুরের মতোই আমরা না খেয়ে এবং কামড়াকামড়ি করে মরি। তাঁর সত্যিকার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে, তিনি সাহিত্যিকদের অবতার-রূপ দেখতে পেয়েছেন।

আজ তাই একটিমাত্র প্রার্থনা,—যদি পরজন্ম থাকেই, তবে আর যেন এদেশে কবি হয়ে না জন্মাই। যদি আসি, বরং শরৎচন্দ্রের মঠের কুকুর হয়েই আসি যেন। নিশ্চিন্তে দুমুঠো খেয়ে বাঁচব।

বর্ষারম্ভে

'বুলবুল'-এর চতুর্থ বার্ষিক জন্মোৎসব এল। বাংলাদেশে সাপ্তাহিক, মাসিক সবরকম পত্রেরই পরমায়ু বৃক্ষপত্রেরই মতো খুব জোর এক বৎসর। এদেশে সাহিত্য-পত্রিকার মৃত্যুর হার বাঙালি শিশুর চেয়েও অধিক। 'বুলবুল' এখন শুধু যে চলছে তা নয়, তার মুখে বাণীও ফুটেছে—আর সে বাণী আধো আধো নয়। তার চলার ভাষায় কোথাও আর জড়তা নেই। আজ তার এই জন্মোৎসবে আমার লেখা কবচ-তাবিজের প্রয়োজন ছিল না, তবু এঁদের শুধু এঁদের নয়, অনেকেরই বিশ্বাস যে সাহিত্য ছেড়ে এসে যার চর্চা করছি তা সংগীত নয়—জ্যোতিষ এবং অকাল্ট সায়েন্স। সাহিত্যিক সাহিত্য ছেড়ে গোরুর গাড়ি চালিয়েছেন হয়তো তারও নজির দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু সাহিত্যিক হাত দেখে, কোষ্ঠী করে ভবিষ্যতে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করছে—এ বোধ হয় শোনা যায়নি। পুরুষের দশ দশা, কিন্তু অপৌরুষ-সম্পন্ন সাহিত্যিকের দশ দশে একশো দশা।

কোনো সাহিত্যিক-উৎসবে আমার আমন্ত্রণ অপরাধ, হয়তো তার চেয়েও বেশি। কেননা, আমি ধর্মভ্রষ্ট, সাহিত্য-সমাজের পতিত। যখন সাদর আমন্ত্রণ আসে এই কবর থেকে উঠে ফেলে-আসা আনন্দ-নিকেতনে ফিরে যাওয়ার, তখন খুব কষ্ট হয়, বড় বেদনা পাই। আমার মৃত সাহিত্য-দেহকে যথেষ্টরও অধিক মাটি চাপা দিতে কসুর করিনি, তবু তাকে নিয়ে আমার বন্ধুরা টানাটানি করেন, কেউ কেউ দয়া করে আঘাতও

করেন। উপায় নেই। মৃত-লোক নাকি মিডিয়াম ছাড়া কথা বলতে পারে না। আজ যে কথা বলছি, তা মিডিয়ামের মারফতই মনে করবেন। অপরিমাণ শ্রদ্ধা নিয়ে সাহিত্যকে আমি বিসর্জন দিয়ে এসেছি, সেই বিসর্জনের ঘাটে এই প্রেত-লোকচারীকে ডেকে যেন বেদনা না দেন, আজ বলবার অবকাশ পেয়ে বন্ধুদের কাছে সেই নিবেদন জানিয়ে রাখি। 'বুলবুল'-এর সাথে আমার স্বগত প্রিয়তম আত্মজের স্মৃতিবিজড়িত। এই বুলবুলিস্তানের গুল-বনে আমার এমন কোনো দান নেই, যাতে এর একটি কুসুম বিকাশেরও সহায়তা করেছে, তবু ওর নামের জন্যই ওর উপর আমার হৃদয়ের টান নিত্য-জোয়ারের মতো।

'বুলবুল' সাহিত্যে—শিল্পে তাজা-বতাজার গান শুনিয়েছে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মন্ত্র-সংগীত গেয়েছে। তার কণ্ঠে আরো বহু বৎসর এই মিলনের গান আনন্দের সুর ঝংকৃত হোক, 'বুলবুল' শতায়ু হোক, এই প্রার্থনা।

আজ চাই কি

আজ চাই সারা ভারতজোড়া একটা বিরাট ওলট-পালট। আজ আর এই পোড়া দেশে মড়ার শ্মশানভূমিতে 'শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা' কাব্যকুঞ্জের মধু গুঞ্জন শোভা পায় না; সে নির্লজ্জ অভিনয় নিদারুণ উপহাসের মতো প্রাণে এসে বেঁধে। আজ চাই মহারুদ্রের ভৈরব গর্জন, প্রলয় ঝঞ্ঝার দুর্বার তর্জন, দুর্দম দুর্মদ উচ্চৈঃশ্রব ঐরাবতের প্রমত্ত বিপুল রণউন্মাদ আর তাদের হ্রেষা-বৃংহনের গগনবিদারী প্রচণ্ড নাদ। আজ অলক-তিলকের সুচারু বিন্যাস মুছে ফেলে ধকধক জ্বলন্ত বহ্নিশিখার মতো ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক পরতে হবে। আজ কোমল কুসুমমালা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মিথ্যাচারী অসুরের অস্থি-কপালের মালা প্রমত্ত বিক্রমে স্ফীত বক্ষে দোলাতে হবে। এ শ্মশানে আজ সবার মুখে স্তিমিত মধুর হাসি নিভে গিয়ে দেখা দিক এক বিকট মৃত্যুকরাল রক্তলোলুপ দুর্নিবার অধর্ম-বিদ্বেষ। আজ অবিচার-কদাচারে ভরা এই বিলাস-আলয়ের কেলি-কুঞ্জে যমরাজ তাঁর যত সব হিংস্র শৃগাল-কুকুর-শুকুনি-গৃধিনীকে একবারে বল্গা আলগা দিয়ে লেলিয়ে দিন। এই মোহ-সুপ্ত মরণ-মগ্ন জাতির বুকের উপরে প্রেত-পিশাচের তাণ্ডব চলতে থাকুক। আজ মিথ্যার সকল সন্ধি, গ্রন্থি ছিন্ন বিদীর্ণ হোক। মিথ্যা-মদিরার সব পেয়ালা ভেঙে চুরমার হয়ে যাক, শয়তানের আরামের আসর হতভম্ব হোক, সারা দেশটা ভরা আজ, এক বিকট উন্মাদলীলা, শুধু মতিচ্ছন্নের প্রলাপ আর ক্লীবের ক্রন্দন। যেখানে যত দোকান-পাট ঘর-সংসার সাজ-সরঞ্জাম সকলের মাঝে এর বিরাট ভণ্ডামি, ধর্মের নামে ফাঁকিবাজি। ভগবানের নাম মুখে এনে যারা শয়তানের ভাবে জীবন পূর্ণ করে কেবল কপটতার, প্রবঞ্চনার, পুণ্য লৌকিকতার বহর জাহির করে, বিধাতার বিশ্বধ্বংসী বজ্রনিষ্ঠুর আঘাতে তাদের অহংকারকে চূর্ণ, নিষ্পেষিত করে

না? এ অন্যায়ের পাশবলীলা এই মানুষের জগতে, এই দেবতার ভারতে আর কতদিন চলবে? নারায়ণ তাঁর অনন্ত শয্যায় আর কতকাল নিদ্রিত থাকবেন? এ সুন্দরী ধরিত্রী যে পাপ-রাক্ষসের দুর্গন্ধ ক্লেদ বিষ্ঠায় জঘন্য নরকে পরিণত হল, ধর্মধ্বজী মায়াবীদিগকে গ্রাস করবার জন্য বিষবহ্নি উদগার করে বাসুকি কি তার সহস্র জিহবা লকলকিয়ে ছুটে আসবে না? আজ কি তার ধৈর্য শেষ সীমায় পৌঁছায় নাই? আজ সাগর-ভূধর-সংসার-কানন-মরু দলিত-মথিত করে আসা চাই মহা-প্রলয়ের মহা-আলোড়ন। ভারতের জীবনের অণু-পরমাণু আজ পচা-গলা বিষবিষ্ঠার বাসা হয়েছে; আজ পরিপূর্ণ সৃষ্টির আয়োজনের জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই আমূল ধ্বংসের প্রয়োজন হবে। এই সত্যযজ্ঞে সকল মিথ্যা অত্যাচারকে পুড়িয়ে ভস্ম না করতে পারলে যজ্ঞ পূর্ণ হবে না। অটল সাধকের বক্ষক্ষারিত যজ্ঞ-হবিতে এ-দেবভূমি স্নিগ্ধ হবে না; হলে পুরাতন জীর্ণ জরা ভারত ভস্মে আচ্ছাদিত না হলে তাতে দেব-জীবনের অভিনব সৃষ্টি জেগে উঠবে না। সৃষ্টির বাঁশরির আকুল করা প্রেরণা সেই দিনই আমাদের মর্মে মর্মে প্রবেশ করবে, যেদিন মহেশের ডম্বরু-বিষাণের শব্দে ভীত-ত্রস্ত হয়ে ভণ্ডামি, ন্যাকামি, অবিচার, অন্যাচারের ছায়া-মূর্তি পর্যন্ত এদেশের জীবনভূমিতে উঁকি মারতে সাহস পাবে না।

আজ চাই, ভরাট-জমাট জীবনের সহজ, স্বচ্ছন্দ, সতেজ গতি ও অভিব্যক্তি। কোথাও কোনো জড়তা, অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও আড়ষ্টতা না থাকে। আজ পথের বাধা পাষাণ অটল হিমাচলের মতো বজ্রদৃঢ় হলেও সত্য-সাধকের পদাঘাতে চক্ষের নিমেষে চূর্ণিত হবে। অমৃতের সন্ধানী যে ভগবৎশক্তি যার শিরায় শিরায় অমিত বীর্যের অক্ষয় ভাণ্ডার সঞ্চিত করছে, তার বল-দর্পিত চরণাঘাতে ত্রিভুবন ভীত-কম্পমান হবেই হবে। তার রোষ-কটাক্ষের সম্মুখে অবিদ্যাজনিত সব ভয় বিতাড়িত হবে। সমাজধর্মের দুরহঙ্কারে উচ্চশির ভূলুণ্ঠিত হবে, এ হতেই হবে। সত্য ও মুক্তির জয়রথের যাত্রাপথ রোধ করতে পারে এমন কোনো যক্ষদক্ষ দানবের নাই। সত্য-সাধককে পথভ্রষ্ট করতে পারে এমন গন্ধর্ব-কিন্নরের মায়া এ দুনিয়ায় নাই। যে সত্যের ভান এ পর্যন্ত পৃথিবীতে দুর্দিনের তরে আপন প্রভাব-মহিমা বিস্তার করে দুর্দিনেই নিজের বোনা জালে, নিজের গড়া শিকলে আবদ্ধ, পঙ্গু ও অবসন্ন হয়ে পড়ত, আজ তার দিন ফুরিয়ে গেছে। আজ ওই নেবে আসছে ভারতের বিশাল জীবনের পরে পরিপূর্ণ সত্যমুক্তির আলোকপাত। আর তারই স্পর্শে তাতে জ্বলে উঠবে বিচিত্র নবসৃষ্টির অফুরন্ত আশা ও আনন্দ। আজ মনকে আঁখি ঠেরে ভাবের ঘরে চুরি করে গোঁজামিল দিয়ে চলতে পারা যাবে না। আজ রাষ্ট্রে যারা অবাধ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষী তাদের সমাজ-ধর্ম ও মুক্তি ব্যাহত থাকলে বিধাতার অলক্ষ্য বিধানে তাদের যে লাঞ্ছনা তাদের ভোগ করতে হবেই হবে। সমাজ-ধর্মে যাঁরা মুক্তির কোনো ছেদ বা সীমা মানতে চান না, তাঁরা যদি এই বিরাট দেশের বুকের উপর রাষ্ট্রপরাধীনতার রাক্ষসীকে বসে বসে রক্ত শুষতে দেন, সে অপরাধে তাঁদের মার্জনা নেই। কোথাও মিথ্যা-অন্যায়ের সাথে মাঝপথে রফা হতে পারবে না, আজ সকল ভারত-মাতার বীর সন্তানকে বুক ঠুকে হেঁকে নিঃসঙ্কোচে এই সত্য প্রচার করতে হবে। মনের কোণে বসে যদি কোনো ছিঁচকাঁদুনি সংস্কার-বুড়ি তোমার আঁচল ধরে পিছনে টেনে রাখতে চায়, তবে তাকে নির্মমভাবে লাথি মেরে তোমার জীবন-গৃহের চতুঃসীমা হতে

বাহির করে দাও। ওগো আমার ওস্তাদ চাষি, তুমি তোমার সাধের জমিতে সোনার ফসল ফলনের আকাঙ্ক্ষা যদি করে থাকো, তাহলে তোমার সেখানে আবর্জনা কন্টক দুষ্টকীটের বাসা পুষে রাখলে চলবে না। সব সাফ করতে হবে। সব জমি গুঁড়িয়ে পিষে ফেলতে হবে, তবে তো ফলবে তাতে পরিপূর্ণ নরজীবনের পরিপুষ্ট ফসল। সকলের শাসনের দায়িত্ব যদি সত্যই হেয় বলে বুঝে থাক, যদি তার পাষাণ-চাপে ফাঁপর হয়ে হাঁপিয়ে উঠে থাক, তবে তুমি কোনো লজ্জায় নিজের ঘরের অত্যাচারের অধীনতা মাথা পেতে নিচ্ছে? এই পরতন্ত্রতার হীনতা হতে না এড়ালে তোমার স্বর্গ নেই, আছে বীভৎস নরক। এ তুমি স্থির জেনো, মুক্তির দিশারি যদি তুমি হয়ে থাক, হতে হবে তোমায় বৃহতের ও মহতের পূজারী। তোমার দেবতার সৌন্দর্য-শক্তি-মহিমা অনাদি অনন্ত, কোনো গুরু-পুরোহিতের মন্ত্রশাস্ত্রের নিগড়ে সে বিরাট পুরুষ বাধা পড়ে নেই। সত্যের স্বরূপ জানাবার মতো আলো তোমার মাঝে আছে।

সাধনার রুদ্রবহ্নি চারিদিকে জ্বালিয়ে তুলে তুমি সকল মিথ্যার অপবাদের দড়াদড়ি পুড়িয়ে ফেলো—জগজ্জয়ী শক্তি তোমার মধ্যে উদ্বুদ্ধ হবে, অনন্ত জ্ঞান ও অটল অফুরন্ত প্রেম তোমার দৃষ্টির ঝাপসা কাটিয়ে দেবে, তোমার প্রাণের শতদলকে বিকশিত করবে। ভাঙাগড়া কোনোটাই অপরটিকে বাদ দিয়ে হতে পারে না, যে গড়তে যাচ্ছে সে যদি না জানে কতখানি জীর্ণ অকর্মণ্য হয়েছে তবে তার গড়ন কিছুতেই দাঁড়াবে না, তার সাধের ইমারত চোখের পলকে ধ্বসে পড়বে। তাই দেশের সেই সঙ্গে নিজের যাঁরা প্রকৃত মঙ্গল ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন তাঁদের ভাঙবার বেলায় মনে কোনো দুর্বলতার স্থান পেতে পারবে না। যে যে অঙ্গে দুষ্ট ব্যাধির জীর্ণ বাসা হয়েছে তার এক চুলও যদি ভাঙতে বাকি থাকে তবে আর রক্ষা নাই। আজ দেখতে পাচ্ছি ভারতের রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে প্রায় ষোলো আনা ঘুণ ধরে গেছে। আজ প্রলয়ের দেবতা ধ্বংসের নেশায় যতই মত্ত হন ততই মঙ্গল। আজ রুষে আসুক কালবৈশাখীর উন্মাদ ঝঞ্ঝা রক্ত-পাথারের অবারিত স্রোতে অযুত ফণা বিস্তার করে, আজ সব অগ্নিবাণ নাগ-নাগিনী বিপুল উল্লাসে বিচরণ করুক। এই প্রলয়-পয়োধিজলে মিথ্যার সৌধশীর্ষ ডুবে যাক। তবেই আবার অনন্ত জীবনের সহস্র দলের উপর বেদ-উদ্ধারণ নারায়ণের আবির্ভাব হবে।

আমার সুন্দর

আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোট গল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। 'ধূমকেতু' 'লাঙল' 'গণবাণী'তে, তারপর এই 'নবযুগে' তাঁর শক্তি-সুন্দর প্রকাশ এসেছিল ; আর তা এল রুদ্র-তেজে, বিপ্লবের, বিদ্রোহের বাণী হয়ে। বলতে ভুলে গেছি, যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈনিকের সাজে দেশে ফিরে এলাম, তখন হক সাহেবের দৈনিক পত্র 'নবযুগে' কি লেখাই লিখলাম, আজ তা মনে নেই ; কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যেই কাগজের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

এই গান লিখি ও সুর দিই যখন, অজস্র অর্থ, যশ-সম্মান, অভিনন্দন, ফুল, মালা—বাংলার ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা পেতে লাগলাম। তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ মাত্র। এই সম্মান পাওয়ার কারণ, সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই, জেলে গিয়ে চল্লিশ দিন অনশন-ব্রত পালন করি রাজবন্দিদের উপর অত্যাচারের জন্য। এই অপরাধে আমাকে জেলের নানারকম শৃঙ্খল-বন্ধন ('লিঙ্ক-ফেটার্স', 'বার-ফেটার্স, 'বার-ফেটার্স', 'ক্রস-ফেটার্স' প্রভৃতি) ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদ-মালা পেয়ে আমি জেলের সর্ব-জ্বালা যন্ত্রণা, অনশন-ক্লেশ ভুলে যাই। আমার মতো নগণ্য তরুণ কবিতা-লেখককে কেন তিনি এত অনুগ্রহ ও আনন্দ দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন। আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিনি, তিনিও বলেননি। আজ এই প্রথম মনে হল, তাঁর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমার সুন্দরের আশীর্বাদ এসেছিল, জেলের যন্ত্রণা-ক্লেশ দূর করতে। তখন কিন্তু একথা মনে হয়নি।

তখনো একথা ভাবতে পারিনি, এ লেখা আমার নয়, এ লেখা আমারি সুন্দরের, আমারি আত্মা-বিজড়িত আমার পরমাত্মীয়ের।

জেলে আমার সুন্দর শৃঙ্খলের কঠিন মালা পরিয়েছিলেন হাতে-পায়ে ; জেল থেকে বেরিয়ে এলেই আমার অন্তরতম সুন্দরকে সারা বাংলাদেশ দিয়েছিল ফুলের শৃঙ্খল, ভালোবাসার চন্দন, আত্মীয়তার আকুলতা। আট বৎসর ধরে বাংলাদেশের প্রায় প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায়, ছোট-বড় গ্রামে ভ্রমণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান গেয়ে, কখনো কখনো বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালাম। এই প্রথম আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ভালোবাসলাম। মনে হলো, এই আমার মা। তাঁর শ্যামস্নিগ্ধ মমতায়, তাঁর গভীর স্নেহ-রসে, তাঁর উদার প্রশান্ত আকাশের কখনো ঘন, কখনো ফিরোজা-নীলে আমার দেহ-মন-প্রাণ শান্ত-উদার আনন্দ-ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে উঠল। আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখলাম প্রকাশ-সুন্দর রূপে, আমার জননী জন্মভূমিরূপে।

আমি সেদিনের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও নেত্রীদের আহ্বানে বাংলাদেশ পরিক্রমণ করেছি ; আমি তরুণদের সাথে মিশেছি—বন্ধু বলে, আত্মার আত্মীয় মনে করে। তারাও আমায় আলিঙ্গন করেছে বন্ধু বলে, ভাই বলে—কিন্তু কোনো দিন আমার নেতা হবার লোভ হয়নি, আজো সে লোভ হয় না। আমার কেবলই যেন মনে হতো, আমি মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছি। জাতি-ধর্ম-ভেদ আমার কোনোদিনও ছিল না, আজো নেই। আমাকে কোনোদিন তাই কোনো হিন্দু ঘৃণা করেননি। ব্রাহ্মণেরাও ঘরে ডেকে আমাকে পাশে বসিয়ে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। এই আমি প্রথম আমার যৌবন-সুন্দর, প্রেম-সুন্দরকে দেখলাম।

তারপর আমার সুন্দর এলেন শোক-সুন্দর হয়ে। আমার পুত্র এল নিবিড় স্নেহ-সুন্দর হয়ে। বাইরে মোমের মতো ছিল সে সুন্দর, মমতায় মধু-মাধুরী, রস-সুরভি ভরা ছিল তার অন্তরে। সে আমাকে আত্মার মতো জড়িয়ে ধরল। যেখানে যেতাম, সে

আমার সাথে যেত। আমার সাথেই খেলত, মান-অভিমান করত। যে সুর শেখাতাম, সে সুর দুবার শুনেই সে শিখে নিত। তখন তার তিন বছর আট মাস বয়স। একদিন রাত্রে বলল, 'বাবা, চাঁদের মধ্যে কে একটি ছেলে আমাকে বাঁশি বাজিয়ে ডাকছে।' হঠাৎ আমার দেহে-মনে কি যেন বিষাদের, বিরহের, বেদনার ঢেউ দুলে উঠল। চোখের জলে বুক ভেসে গেল। সেই রাত্রে তার প্রবল জ্বর এল। ভীষণ বসন্ত-রোগে ভুগে হাসতে হাসতে আনন্দধামের শিশু আনন্দধামে চলে গেল।

আমার সুন্দর-পৃথিবীর আলো যেন এক নিমিষে নিভে গেল। আমার আনন্দ, কবিতা, হাসি, গান যেন কোথায় গেল, আমার বিরহ, আমার বেদনা সইতে না পেরে। এই আমার শোক-সুন্দর!

এই আমার প্রথম প্রশ্ন জাগল—কোন নিষ্ঠুর এই সৃষ্টি করে, কেন সে শিশু-সুন্দরকে কেড়ে নেয়? এই শোকের মাঝে জেগে উঠল স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রগাঢ় অভিমান, সেই অভিমান ঘনীভূত হয়ে আমার সর্ব অস্তিত্বে দেখা দিল ভীষণ মৌন বিদ্রোহ হয়ে, বিপ্লব হয়ে। চারিদিকে কেবল ধ্বনি উঠতে লাগল, 'সংহার করো! ধ্বংস করো! বিনাশ করো!' কিন্তু শক্তি কোথায় পাই! কোথায়, কোনো পথে পাব সেই প্রলয়-সুন্দরের, সংহার-সুন্দরের দেখা? আমি বসে চিন্তা করতে লাগলাম। কোথা হতে একজন সাথী এসে বললেন—'ধ্যান করো, দেখতে পাবে।' আমি বললাম, 'ধ্যান কি?' তিনি বললেন, 'একমাত্র তাঁকে ডাকা ও তাঁর চিন্তা করা।' এই প্রথম এলেন আমার ধ্যান-সুন্দর। মাঝে মাঝে ভালো লাগত, মাঝে মাঝে লাগত না। মাঝে মাঝে ভ্রান্তি, মায়া আমাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাতে লাগল। তাঁরা বলল, 'আমরা তোমার প্রলয়-সুন্দরের প্রলয়-শক্তি, আমাদের সাথে পথ চলো, তাহলে স্রষ্টাকে দেখতে পাবে—তাহলে আমাদের শক্তিতে সংহার করতে পারবে।' আমার যে সহজ সাবলীল আনন্দ-চঞ্চলতা, যৌবনের মদির উন্মাদনা, গান, কবিতা ও সুরের রসমাধুরী ছিল, এদের সাথে পথ চলে যেন সব শুকিয়ে গেল।

আমি আমার প্রলয়-সুন্দরকে প্রাণপণে ডাকতে লাগলাম, 'পথ দেখাও, তোমার পথ দেখাও।' কে যেন স্বপ্নে এসে বলল, 'কোরান পড়ো; ওতে যা লেখা আছে, তা পড়লে তোমার প্রলয়-সুন্দরকে—আমারও উর্ধ্বে তোমার পূর্ণতাকে দেখতে পাবে।' আমি নমস্কার করে বললাম, 'তুমিই কি আমার কবিতায়, লেখায় বিদ্রোহ হয়ে বিপ্লব-বাণী হয়ে আমার কল্পনায়, আমার চেতনায় প্রকাশিত হয়েছিলে?' তিনি আমায় বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তোমারই পূর্বচেতনা—প্রিকন্‌শ্যাস্‌নেস।' ইংরাজিতে বললেন, বোধ হয়, আমি যদি পূর্বচেতনার অর্থ না বুঝি তাই। আমি বললাম, 'আবার তোমার সাথে দেখা হবে?' তিনি বললেন, 'আমি যে নিত্য তোমার মাঝে আছি, আমি যে তোমার বন্ধু!' তিনি চলে গেলেন। সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল, কিন্তু শিরায়-শিরায় অণু-পরমাণুতে সেই স্বপ্নের আনন্দ-অমৃতের শিহরণ সর্ব অঙ্গে জড়িয়ে রইল প্রিয়ার পুষ্পমালার মতো হয়ে।

গোপনে পড়তে লাগলাম, বেদান্ত, কোরান। আমার পৃথিবীর আকাশ যেন কোনো বজ্রনাদে ও তড়িৎ-লেখার তলোয়ার বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি যেন আরো, আরো উর্ধ্বে

যেতে লাগলাম। দূর হতে দেখতে পেলাম অপরূপ স্বর্ণ-সুন্দর জ্যোতি। এই আমার স্বর্ণ-জ্যোতি সুন্দরকে প্রথম দেখলাম।

সহসা যেন কোনো করাল ভয়ঙ্কর-শক্তি আমায় নিচের দিকে টানতে লাগল। বলতে লাগল, 'তোমার মাতৃ-ঋণ—তোমার স্বদেশের ঋণ-শোধ না হতে কোথায় যাবে উন্মাদ?' আমি বললাম, 'সাবধান! আমার মাঝে আমার প্রলয়-সুন্দর আছেন।' সেই ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধ শক্তি প্রবল বেগে নিম্নপানে টানতে লাগল। বলল, 'সেই প্রলয়-সুন্দর তোমার মতো অজ্ঞানোন্মাদ নন, তোমার সেই পৃথিবীর ঋণ, ভারতের ঋণ, বাংলার ঋণ, মানব-ঋণ, তোমার আত্মার আত্মীয়ের ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ না করে তুমি যেতে পারবে না।' আমি বললাম, 'তুমিই কি কোরানে লিখিত অভিশপ্ত শয়তান।' সে হেসে বলল, 'হাঁ, চিনতে পেরেছ দেখে আনন্দিত হলাম। কোরানে কি পড়ো নাই, আমার ঋণ শোধ না করে তুমি স্রষ্টার কাছে যেতে পারবে না, তাঁকে দেখতে পাবে না, আমার বাধাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না!' অনুভব করতে লাগলাম, আমার প্রলয়-সুন্দর আর যেন সাহায্য করছেন না। মাটির মানুষ মাটিতে ফিরে এলাম। এই পৃথিবীর মাটির মায়া আমাকে মায়ের মতো প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরলেন, চুম্বন করতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন। আমি বিদ্রোহ করে এই বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলে সেই ভয়ংকর শক্তি পৃথিবীর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ভীষণ প্রহার করতে লাগলেন। আমার সহধর্মিনী অর্ধাঙ্গিনী শক্তিকে অর্ধপঙ্গু করে শয্যাশায়ী করে দিলেন! অর্থ কমিয়ে দিলেন, ভীষণ ঋণ-দেনার রজ্জু বন্ধন করে প্রহার করতে লাগলেন।

আমার পৃথিবী এসে আমাকে ধরে আমার জ্বালা জুড়িয়ে দিলেন। এমন সময় এলেন আমার এক না-দেখা বন্ধু। তিনি তাঁর বন্ধু, আমার এক বিদ্রোহী বন্ধুর মারফতে আমায় অপরূপ চৈতন্য দিলেন। আমি আবার এই প্রথম ধরিত্রী-সুন্দর মাকে ভালোবাসলাম, জড়িয়ে ধরলাম! আমার সমস্ত জ্বালা যেন ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যেতে লাগল! আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল! আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে, বাংলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম, দৈন্যে, দারিদ্র্যে, অভাবে, অসুরের পীড়নে তিনি জর্জরিতা হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে-চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈন্য-দানব-রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত। আমি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বললাম, 'আমি ব্রহ্ম চাই না, আল্লাহ চাই না, ভগবান চাই না। এইসব নামের কেউ যদি থাকেন, তিনি নিজে এসে দেখা দেবেন! আমার বিপুল কর্ম আছে, আমার অপার অসীম এই ধরিত্রী মাতার ঋণ আছে! আমার বন্দিনী মাকে অসুরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে আবার পূর্ণশ্রী-সুন্দর আনন্দ-সুন্দর না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই, আমার শান্তি নেই।'

ভয়ংকর শক্তি আনন্দে হেসে উঠল। আমি বললাম, 'এ তোমার অভিনয়!' সে বলল, 'এই আমি প্রথম তোমার কাছে সত্যি করে হাসলাম, অভিনয় করিনি।' চেয়ে দেখি, আমার পানে চেয়ে পৃথিবীর ফুল আনন্দে ঝরে পড়ল। আমি মাটি থেকে তাকে বুকে তুলে বললাম, 'কেন তুমি ঝরলে?' ফুল বললে, 'আমার মা-লতাকে জিজ্ঞাসা করো, আমার মাঝে আমার সুন্দর আছেন, সেই সুন্দরকে দেখে আমি আনন্দে ঝরে

পড়লাম।' আমি ফুলকে চুম্বন করলাম, অধরে বক্ষে কপোলে রেখে আদর করলাম। ফুল বলল, 'আমার সুন্দরকে পেয়েছি, আমার এই রূপ-রস-মধু-সুরভি নিয়ে তোমার মাঝে নিত্য হয়ে থাকব।' এই আমি প্রথম পুষ্পিত সুন্দরকে দেখলাম। এইরূপে চাঁদের আলো, সকাল-সন্ধ্যার অরুণ-কিরণ, ঘনশ্যাম-সুন্দর বনানী, তরঙ্গ-হিল্লোলিতা ঝর্না, তটিনী, কূলহারা নীল-ঘন সাগর, দশদিক-বিহারী সমীরণ আমায় জড়িয়ে ধরল। আমার সাথে মধুর ভাষায় বন্ধুর মতো সখার মতো, কথা কইল। আমায় 'আমার সুন্দর' বলে ডাকল।

সহসা এল ঊর্ধ্ব-গগনে বৈশাখী ঝড়, প্রগাঢ় নীলকৃষ্ণ মেঘমালাকে জড়িয়ে। ঘন ঘন গম্ভীর ডমরু ধ্বনিতে, বহ্নিবর্ণা দামিনী-নাগিনীর ত্বরিত চঞ্চল সঞ্চারণ আমার বাহিরে-অন্তরে যেন অপরূপ আনন্দ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। সহসা আমার কণ্ঠে গান হয়ে, সুর হয়ে আবির্ভূত হলো—'এল রে প্রলয়ঙ্কর সুন্দর বৈশাখী ঝড় মেঘমালা জড়ায়ে!' আমি সজল ব্যাকুল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম, 'তুমি কে—কে?' মধুর সহজ কণ্ঠে উত্তর এল, 'তোমার প্রলয়-সুন্দর বন্ধু।'

আমি তখন বললাম, 'তুমি তো আমায় ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলে, আবার কি জন্যে এলে?' সে আমার আত্মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি স্রষ্টাকে সংহার করে, তোমার মাকে সংহার করতে, মাতৃহত্যা করতে চেয়েছিলে, আত্মসংহার করতে চেয়েছিলে। তাই আমি তোমার দুধারি তলোয়ার কেড়ে নিয়ে অভিমানে ফিরে গেছি। তোমার চৈতন্য ঘিরে এসেছে, তোমার মাঝেই তোমার স্রষ্টাকে দেখতে পাবে আজ—সৃষ্টিতে, পৃথিবীতে, আকাশে, বাতাসে, রস-ভরা ফলে, সুরভিত ফুলে, স্নিগ্ধ মৃত্তিকায়, শীতল জলে, সুখদায়ী সমীরণে, তোমরা সৃষ্টিসুন্দরকে প্রকাশ-স্বরূপে দেখেছ। তোমার না-দেখা পরম প্রিয়তম, পরম বন্ধুকে পেতে, বিপুল অসহ তৃষ্ণা, স্বপ্ন, সাধ, কল্পনা, বাঁধ-না-মানা বেগসহ অসীমের পানে প্রবল প্রবাহ নিয়ে উজান গতিতে ঊর্ধ্বের পানে চলেছিলে, আজ সেই পরম পূর্ণতার, পরম শান্তির, পরম মুক্তির আনন্দবাণী নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি তোমার বন্ধু হয়ে। এই পৃথিবীতেই তাঁর সঙ্গে তোমার অপরূপ পূর্ণ মিলন হবে। তার আগে তোমাকে এই অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে হবে; সর্ব অসাম্য, ভেদকে দূর করতে হবে। মানুষ যে তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। তারপর হবে তোমার সুন্দরের সাথে পরম বিলাস, পরম বিহার।'

শুনে আমি অপরূপ আনন্দে মাভৈঃ ধ্বনি করে বললাম, 'তবে দাও বন্ধু আমার দুধারি তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বিপ্লবের বিষাণ-শিঙ্গা, দাও আমায় অসুর-দৈত্য-সংহারী ত্রিশূল ডমরুধ্বনি! দাও আমায় ঝঞ্ঝার জটিল জটা, দাও আমায় বাংলার সুন্দরবনের বাগাম্বর। দাও ললাটে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, দাও আমার জটাজুটে শিশু শশীর স্নিগ্ধ হাসি। দাও আমায় তৃতীয়-নয়ন, দাও সেই তৃতীয় নয়নে অসুর-দানব-সংহারের শক্তি। দাও আমার কণ্ঠে এই পৃথিবীর বিষ, করো আমায় বিষ-সুন্দর নীলকণ্ঠ। দাও আমায় দামিনী-তড়িতের কণ্ঠমালা। দাও আমার চরণে নটরাজের বিষম তালের নৃত্যায়িত ছন্দ।'

বন্ধু হেসে বললেন, 'সব পাবে, তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নেই। আর কিছু দিন দেরি আছে। তুমি অভিমান করে বিদ্রোহ করে নিজের কি ক্ষতি করেছ, নিজে কি কখনো চেয়ে দেখেছ? তুমি অরণ্য-কণ্টক-কর্দমাক্ত পথে নিজের সর্বাঙ্গকে ক্ষত-বিক্ষত শক্তিহীন করে ফেলেছ। তোমার এইসব অপূর্ণতা পূর্ণ হোক, তখন তোমার প্রলয়-সুন্দর তোমার সর্বদেহে আবির্ভূত হবেন। তোমার সুন্দরকে তুমি লতার মতো জড়িয়ে ধরবে, তার না-শোনা বাণী তোমার লেখায় ফুলের মতো ঝরে পড়বে।' আমি বললাম, 'তথাস্তু!' প্রলয়-সুন্দর বললেন, 'সাধু! সাধু! তথাস্তু!'

সত্যবাণী

ইসলাম জাগো! মুসলিম জাগো। আল্লাহ তোমার একমাত্র উপাস্য, কোরআন তোমার সেই ধর্মের, সেই উপাসনার মহাবাণী,—সত্য তোমার ভূষণ, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা তোমার লক্ষ্য,—তুমি জাগো। মুক্ত বিশ্বের বন্যশিশু তুমি, তোমায় পোষ মানায় কে? দুরন্ত চঞ্চলতা, দুর্দমনীয় বেগ, ছায়ানটের নৃত্য-রাগ তোমার রক্তে, তোমাকে থামায় কে? উষ্ণ তোমার খুন, মস্ত তোমার জিগর, দারাজ তোমার দিল, তোমাকে রুখে কে? পাষাণ কবাট তোমার বক্ষ, লৌহ তোমার পঞ্জর, অজেয় তোমার বাহু—তোমায় মারে কে? জন্ম তোমার আরবের মহামরুতে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা তোমার পর্বতগুহায়, উদাত্ত তোমার বিপুল বাণীর প্রথম উদ্বোধন 'কোহ্-ই তুরের' নাঙ্গা শিখরে,—তুমি অমর, তুমি চির জাগ্রত। 'আল্লাহু আকবর' তোমার ওংকার, আলি তোমার হুংকার, তুমি অজেয়! বীর তুমি, তোমার চিরন্তন মুক্তি, শাশ্বত বন্ধনহীনতা, 'আজাদির' কথা ভুলায় কে? তোমার অদম্য শক্তি, দুর্দমনীয় সাহস, তোমার বুকে খঞ্জর চালায় কে? ইসলাম ঘুমাইবার ধর্ম নয়, মুসলিম শির নত করিবার জাতি নয়। তোমার আদিম জন্মদিন হইতে তুমি বুক ফুলাইয়া, শির উচ্চ করিয়া দুর্লঙ্ঘ, মহাপর্বতের মতো দাঁড়াইয়া আছ, তোমার গগনচুম্বী শিখরে আকাশ ভরা তারার আলো, অর্ধচন্দ্রের প্রদীপ্ত প্রশান্তি জ্যোতি—তোমার যে মহাগৌরবের কথা বিশ্বে চির-মহিমান্বিত। মনে পড়ে কি, তোমার সেই রক্ত-পতাকা যাহা বিশ্বের সিংহদ্বারে উড়িয়াছিল,—তোমার সেই শক্তি যাহা দুনিয়া মথিত আলোড়িত করিয়াছিল? বলো বীর, বলো আজ তোমার সে শক্তি কোথায়? বলো ভীরু, তোমার সে প্রচণ্ড উগ্র মহাশক্তিকে কে পদানত করিল? উত্তর দাও! তোমায় আমি আল্লার নামে আহ্বান করিতেছি, উত্তর দাও! তোমার অপমান কেহ কখনো করিতে পারে নাই, ইসলাম অবমাননা সহে নাই। তুমি সত্য, ইসলাম সত্য, তোমার-আমার বা ইসলামের অপমান যে সত্যের অপমান। তাহা যে সহ্য করে, সে ভীরু—সে ক্ষুদ্র! যেদিন তুমি তোমার উদারবাণী মহাশিক্ষা ভুলিয়া স্বাধীনতার বদলে অধীনতার ছায়া মাড়াইতে গিয়াছ সেই দিনই তোমার শিরে মিথ্যার, দুশমনের ভীমপ্রহরণ বাজিয়াছে।

ইসলাম এক মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো নিকট শির নোয়ায় না। তোমার চির-উচ্চ চির-অটল ঋজু সেই শির আনত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাই আজ তুমি আঘাত পাইয়াছ, তাই তোমার বক্ষে বজ্রবেদন, শক্তিশেল বাজিয়াছে! যদি আঘাতই খাইয়াছ, যদি আজ এমন করিয়া গভীর বেদনাই তোমার মর্মে বাজিয়াছে, যদি এই প্রথম অবমানিত হইয়াছ, তবে তোমার লাঞ্ছিত সত্য, ক্ষুব্ধ শক্তি আবার উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের মতো উদ্বেলিত হইয়া উঠুক! বলো, ইসলাম ভিক্ষা করে না, যাচ্ঞা করে না। বল, দুর্বলতা আমাদের ধর্মে নাই! বলো, আমাদের প্রাপ্য আমাদের মুক্তি আমরা নিজের শক্তিতে লাভ করিব!... তোমার বাঁধে ভাঙন ধরিয়াছে, তোমাকে ইহা হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। তাই আজ আমরা আমাদের সারা বিশ্বের লাঞ্ছিত বিক্ষুব্ধ শক্তি লইয়া এই মুক্ত মহা-গগন-তলে দাঁড়াইয়া বলিতে চাই—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' এই মুক্ত গগনতল তোমার মহাতীর্থস্থান-আরাফাতের ময়দান অপেক্ষাও পবিত্র। এইখানে গৃহহীন পথহারা নিপীড়িত মুসলিম সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব পাইয়াছে, ঈদের দিনের মতো পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছে, বুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। এই উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া মুসলিম, আবার বলো, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' যদিও তুমি সর্বস্বহারা হও, কোথাও তোমার মাথা গুঁজিবার ঠাই না থাকে, কুছ পরোয়া নেই, তোমার মাথা নত করিও না। আবার সকলি পাইবে। মুসলিম হীন, এ ঘৃণার কথা শুনিবার পূর্বে কর্ণরন্ধ্রে সিসা ঢালিয়া বধির হইয়া যাও! তোমাদের এই 'ইখওয়াৎ'কে কেন্দ্র করিয়া আমাদের অন্তরের সত্য স্বাধীন শক্তিকে যেন কোনোদিন বিসর্জন না দিই। তোমার বীর ভাইগুলি ঐ যে তোমার দক্ষিণপার্শ্বে ইসলামের এই শাশ্বত সত্য রক্ষার জন্য হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিতেছে, সেই শহিদায়েন নব্য তুর্কি-তরুণদের দেখো, আর গৌরবে তোমার বক্ষ ভরিয়া উঠুক। তাহাদের পানে তাকাও, তাহাদের অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা শোনো—তাহাদের হুংকারে তোমার হিম-শীতল রক্ত উষ্ণ হইয়া বহিয়া যাক তোমার শিরায় শিরায়। মেঘ-মুক্ত প্রাবৃট-মধ্যাহ্নের রক্ত ভাস্কর তোমার বিপুল ললাটের ভাস্বর রাজটিকা হউক। তুমি অমর হও! তুমি স্বাধীন হও! তোমার জয় হউক।

ব্যর্থতার ব্যথা

পৃথিবী তাহার ভোগ-সম্ভার চোখের সম্মুখে লইয়া জাগিয়া আছে অনন্তাকাল ধরিয়া।

বিপুল ক্ষুধার তীব্র তাড়নে ছুটিয়া চলি। দুই হাত পাতিয়া আমরা ক্ষুধার অন্নভিক্ষা চাই। ধরণী মুখ ফিরাইয়া দূরে সরিয়া যায়।

ধীরে ধীরে আঘাত আসে, বেদনা আসে, দৈন্য-দুঃখ-দারিদ্রের তাণ্ডব লীলা চলে জীবনের শ্মশানে প্রাঙ্গণে।

প্রেম ভালবাসা আত্মীয়তা বান্ধবতার মধ্যে জাগিয়া উঠে জীবনব্যাপী বঞ্চনার নিষ্ঠুর পরিহাস!

অন্তর-জগতে কাঁদিয়া মরে যুগ-যুগান্তরে মথিত মানুষ। অত্যাচার অনশন-নিষ্পেষণের মাঝেও প্রাণ চায় জীবনের তৃপ্তি।

* * *

জ্ঞানী তাহার দানে জগৎকে প্রভাবান্বিত করিল। কবির দানে ধরিত্রীর প্রাণ সরস হইয়া উঠিল। ধনী তাহার সর্বস্ব দান করিয়া প্রতিদানে অমর হইয়া রহিল।

শত শতাব্দী ধরিয়া আমি দান করিয়া আসিলাম—শরীরের রক্ত, দেহের শক্তি, এক কথায় সমস্ত জীবনটাকে। প্রতিদানে পাইলাম নিপীড়ন, বন্ধন, বঞ্চনা, অপমান আর বুকভরা বেদনা!

অন্ধকার রাত্রি। ঊর্ধ্বে বহু ঊর্ধ্বে ম্লান নক্ষত্রের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম : উঃ কি অকরুণ এই জীবন। সুখ শান্তি আনন্দ কিছুই নাই—আছে কেবল রিক্ততার হাহাকার!

প্রাণের গহন অন্ধকার হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল : 'মিথ্যা কথা! তোমার ব্যথা, তোমার ব্যর্থতা আজ সার্থকতার পরিপূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করে জেগেছে। প্রতীচীর স্বার্থ-মন্দির ভেঙে পড়েছে; মিশরের পিরামিড কেঁপে উঠেছে; চীনের প্রাচীরে ভাঙন লেগেছে; হিমালয় দুলে উঠেছে। তোমার ব্যথার ভিতর দিয়ে সত্যের বাণী এসেছে :—মানুষ পাবে তার মানবীয় সর্ব-প্রয়োজনের সম-অধিকার।'

কি আশ্চর্য! আমার এই সার্থকতা বেদনার আড়ালে কেমন করিয়া লুকাইয়াছিল।

হে আমার জীবনের ব্যথা। তোমায় নমস্কার।

গণবাণী
১৯২৭

ধূমকেতুর আদি উদয়-স্মৃতি

প্রায় দশ বছর আগের কথা। স্মৃতি-মঞ্জুষায় সে কথা হয়তো আজ ধূলিমলিন হইয়া গিয়াছে। ১৩০৯ সাল, শ্রাবণ মাস—'রাতের ভালে অলক্ষণের তিলক-রেখা'র মতোই 'ধূমকেতুর প্রথম উদয় হয়। তখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সক্রিয় ধুলোট-উৎসব পুরা-মাত্রায় জমিয়া উঠিয়াছে। কারাগারে লোক আর ধরে না, ধরা দিতে গেলে পুলিশের ধরে না—'বন্দে মাতরম', 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' রব আকাশে-বাতাসে আর ধরে না। মার খাইয়া পিঠ শিলা হইয়া গিয়াছে, মারিয়া মারিয়া পুলিশের হাতে কিল ধরিয়া গিয়াছে। মার খাইবার সে কি অদম্য উৎসাহ! পুলিশের পায়ে ধরিলেও সে আজ মারে না; পলাইয়া যায়।

ইহারাই মাঝে সর্বপ্রথম প্রলয়েশ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। দেশের নেতা অপনেতা হবু-নেতা সকলে যখন বড় বড় দুরবিন লাগাইয়া স্বরাজের উদয়-তারা খুঁজিতেছিলেন, তখন

আমার উপরে শিব ঠাকুরের আদেশ হইল, এই আনন্দ-রজনীকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিতে। আমার হাতে তিনি তুলিয়া দিলেন 'ধূমকেতু'র ভয়াল নিশান। স্বরাজ-প্রত্যাশী দল নিন্দা করিলেন, গালি দিলেন। বহু ধূলি উৎক্ষিপ্ত হইল, বহু লোষ্ট্র নিক্ষেপিত হইল। 'ধূমকেতু'কে তাহা স্পর্শ করিতে পারিল না।

আমার ভয় ছিল না আমার পিছনে ছিলেন বিপুল প্রমথ-বাহিনীসহ দেবাদিদেব প্রলয়নাথ।

'ধূমকেতু' কল্যাণ আনিয়াছিল কি না জানি না ; সে অকল্যাণের প্রতীক হইয়াই আসিয়াছিল। 'ধূমকেতু' তাহাদের বাণী লইয়া আসিয়াছিল—যাহাদের গৃহী আশ্রয় দিতে ভয় পায়, গহন বনে ব্যাঘ্র যাহাদের পথ দেখায়, ফণি তাহার মাথার মণি জ্বালাইয়া যাহাদের পথের দিশারি হয়, পিতামাতার স্নেহ যাহাদের দেখিয়া ভয়ে তুহিন-শীতল হইয়া যায়।

রুদ্রদেব আশীর্বাদ করিলেন, আমার কারা-শুদ্ধি হইয়া গেল। প্রয়োজনের আহ্বানে নটনাথের আদেশে আমি নিশানবর্দার হইয়াছিলাম। তাহারই আদেশে 'ধূমকেতু' অন্ধ বিমান-পথে হারাইয়া গিয়াছে।

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক আবার 'ধূমকেতু'কে আহ্বান করিতেছে। কোনো রূপে 'ধূমকেতু'র উদয় হইবে জানি না। তবু আশা আছে, যে ধূর্জটির জটাজুটে 'ধূমকেতু' ময়ূর-পাখা, সেই ধূর্জটির রুদ্র আশীর্বাদ সে লাভ করিবে, এ-যুগের প্রলয়েশ তাহাকে নবপথে চালিত করিবে। আমি ইহার অগ্নিশিখায় সমিধ জোগাইব মাত্র।

ধূমকেতু
৫ই ভাদ্র, ১৩৩৮

ধর্ম ও কর্ম

যে স্বধর্মে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, তার কর্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশের কোনো অধিকার নাই। আজ যাঁরা দেশের কর্মী বলে খ্যাত, তাঁদের অনেকেই অনধিকারী বলেই ক্ষেত্রে লাঙলই চালিয়ে গেলেন, ফসল আর ফলল না। সামান্য যা ফসল ফলল, তাকে রক্ষা করার প্রহরী, সৈন্য পেলেন না। যিনি নিজে স্বাধীন হলেন না, তিনি দেশের, জাতির স্বাধীনতা আনবেন কেমন করে? যাঁর নিজের লোভ গেল না, যিনি নিজে দিব্য সত্তালাভ করেননি, তিনি কেমন করে লোভীকে তাড়াবেন, কোন শক্তিতে দৈত্য, অসুর, দানবকে সংহার করবেন? ধর্মভাব মানে এ নয় যে শুধু নামাজ, রোজা, পূজা, উপাসনা নিয়েই থাকবেন। কর্মকে যে ধার্মিক অস্বীকার করলেন, কর্মকে সংসারকে যিনি মায়া বলে বিচার করলেন,

কর্ম, সংসার ও মায়ার স্রষ্টার তিনি বিচার করলেন। যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম যাঁর কোনো শরিক নাই, যিনি একমাত্র বিচারক, তাঁর সৃষ্টির বিচার করবে কে? এই পলাতকের শাস্তি সঞ্চিত আছে। তবে মাঝে মাঝে পালিয়ে যেতে হয়, একেবারে পগার পার হয়ে গেলে চলবে না। সমুদ্রের জল আকাশে পালিয়ে যায় বলেই বৃষ্টিধারা হয়ে ঝরে পড়ে।

নবনীরদ পাহাড়ে পালিয়ে যায় বলেই নদীস্রোত হয়ে ফিরে আসে। এই উপরের দিকে উড়ে যাওয়া—অর্থাৎ আমাদের পরম প্রভুর ধ্যান করা মানে সময় নষ্ট করা নয়, আমাদেরই না-জানা পূর্ণতাকে স্বীকার করা; আমারই ঘুমন্ত অফুরন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। নির্লোভ, নিরহংকার, দ্বন্দ্বাতীত হলে—লোভ, অহংকার ও দ্বন্দ্বের মাঝে নেমে অবিচলিত শান্ত চিত্তে কর্ম করা যায়। প্রশংসা, জয়ধ্বনি, অভিনন্দন তখন কর্মীকে ফানুসের মতো ফাঁপিয়ে তোলে না। নিন্দা, হিংসা, অপমান, পরাজয় তখন কর্মীকে নিরাশ করতে পারে না, তাঁর অটল, ধৈর্য ও বিশ্বাসকে টলাতে পারে না। মন্দ-ভালো দুয়ের মধ্যেই ইনি পূর্ণ-অভয়চিত্তে বিচরণ করতে পারেন। তসবি অর্থাৎ জপমালা ও তরবারি দুই-ই তাঁর সমান প্রিয় হয়ে ওঠে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণের অতীত হয়েও ইনি ওই তিনগুণে নেমে বিপুল কর্ম করতে পারেন। এই সেনাপতি সাগরের মতো কখনো শান্ত, কখনো অশান্ত ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। এঁরই আহ্বানে, এরই আকর্ষণে ছুটে আসে দেশ-দেশান্তর থেকে স্রোতস্বিনী দুর্নিবার অনিরুদ্ধ প্রবাহ নিয়ে।

ত্যাগ ও ভোগ—দুয়েরই প্রয়োজন আছে জীবনে। যে ভোগের স্বাদ পেল না, তার ত্যাগের সাধ জাগে না। ক্ষুধিত উপবাসী জনগণের মধ্যে এই সেনাপতি, অগ্রনায়ক আগে প্রবল ভোগের তৃষ্ণা জাগান। অবিশ্বাসী নিদ্রাতুর জনগণের বুকে রাজসিক শক্তি জাগিয়ে তাদের তামসিক জড়তা নৈরাশ্যকে দূর করেন। রাজসিক শক্তিকে একমাত্র সাত্ত্বিকী শক্তি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই ভগ্নতন্দ্রা বিপুল গণশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেন যে-অগ্রনায়কের কথা বলেছি—তিনি।

জনগণকে শুধু উর্ধ্বে কথা বললে চলবে না। তাদের বুকে ভালো খাবার, ভালো পরবার উদগ্র তৃষ্ণাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই জাগ্রত ক্ষুধিত সিংহ ও সুন্দর বনের বাঘের দল যাতে উৎপাত না করে, তার ভার নেবেন সেই মায়াবী অগ্রনায়ক। যিনি এই ভীষণ শক্তিকে জাগাবেন, তাকে সংযত করার শক্তি যেন তাঁর থাকে। নইলে জগৎ আবার পশ্চিমের রাজসিক উন্মত্ততায় রক্ত-পঙ্কিল হয়ে উঠবে। নিজেরাই হানাহানি করে মরবে।

এদের ভোগের ক্ষুধাও জাগাতে হবে, ত্যাগের আনন্দে রসের তৃষ্ণাও জাগাতে হবে।

আমি একবার 'নিউমার্কেটে'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি, এক ভদ্রলোকের নগ্নবক্ষে যজ্ঞোপবীত, আর দুই হাতের এক হাতে একগোছা রজনীগন্ধা ও আর একহাতে দুইটি রাম-পাখি—মুরগি। আমার অত্যন্ত আনন্দ হলো, তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললাম: 'ফেয়ার ও ফাউলের' এমন 'কম্বিনেশন'—সঙ্গতি আর দেখি নাই! ভদ্রলোকও আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন: 'নিত্য আপনার হাতে ফুল, পাতে মুরগি পড়ুক।'

মুরগির সাথে রজনীগন্ধার তৃষ্ণাও থাকবে?

বড় ত্যাগ তাঁর জন্য, যিনি সকলকে বড় করবেন। জনগণকে তাই বলে ধর্মের আশ্রয়চ্যুত করবার অধিকার কারুর নেই। এ অধিকারচ্যুত করতে চাইবেন যিনি, তিনি মানবের নিত্য কল্যাণের, শান্তির শত্রু। মানুষের অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ রাজসিক শক্তি দিতে পারে না। মানুষ পেট ভরে খেয়ে, গা-ভরা বস্ত্র পেয়ে সন্তুষ্ট হয় না, সে চায় প্রেম, আনন্দ, গান, ফুলের গন্ধ, চাঁদের জ্যোৎস্না। যদি শোকে সান্ত্বনা দিতে না পারেন, কলহ-বিদ্বেষ দূর করে সাম্য আনতে না পারেন, আত্মঘাতী লোভ থেকে জনগণকে রক্ষা করতে না পারেন, তা হলে তিনি অগ্রনায়ক নন। ধর্ম ও কর্মের যোগসূত্র যদি মানুষ না বাঁধা পড়ে, তাহলে মানুষকে এমনি চিরদিন কাঁদতে হবে।

'লাঙল'

যেখানে দিন দুপুরে ফেরিওয়ালি মাথায় করে মাটি বিক্রি করে, সেই আজব শহর কলিকাতায় 'লাঙল' চালাবার দুঃসাহস যারা করে, তাদের সকলেই নিশ্চিত পাগল মনে করছেন। কিন্তু সেই পাষাণ শহরেই আমরা 'লাঙল' নিয়ে বেরুলাম। এই পাষাণের বুক চিরে আমরা সোনা ফলাতে চাই। ব্রহ্মপুত্র-স্রোত হিমালয়ে আটকে গেলে হলধর লাঙলের আঘাতে পাহাড় চিরে সেই স্রোতকে ধরায় নাবিয়ে ছিলেন। সেই জল কত প্রান্তর শ্যামল করে কত তৃষিত কণ্ঠের পিপাসা মিটিয়ে বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। 'লাঙলবন্ধ' আজ বাংলার তীর্থ। মহাত্মাগণের আন্দোলন আজ নেতাদের পাষাণ-পারিপার্শ্বিকে আটকে গেছে তাই আজ আবার হলধরের ডাক পড়ছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রয়োজনে শহরের সৃষ্টি হয়ে পল্লিভূমি বাংলার সভ্যতা ও সাধনা লোপ পেতে বসেছে। শাসন এবং শোষণের সহায়তার যন্ত্রস্বরূপে ভদ্র-সম্প্রদায় আত্মবিক্রয় করে শহরে উঠে এসেছেন। গ্রামের আনন্দ উৎসব রোগ-শোকের চাপে লুপ্ত হয়ে গেছে। শহরের বেকার বাঙালি আজ বুঝছে গ্রাম ছেড়ে এসে তার কি নিরুপায় অবস্থাই হয়েছে। জমিদার আর গ্রামের সকল কর্মের ত্রাণ-স্বরূপে উপস্থিত নন—তিনি শহরে এসে বাস করে মদমাংস মেয়েমানুষ মোটর মামলা এই পঞ্চম-কারের সাধনায় নিযুক্ত আছেন। নায়েব-গোমস্তার অত্যাচারে প্রজার প্রাণ ওষ্ঠাগত। মহাজনের হাতে জমির স্বত্ব চলে যাচ্ছে। গৃহহীন ভূমিহীন লক্ষ লোক সমাজের অভিশাপ নিয়ে শহরের দিকে ছুটছে—কলকারখানায় কতক ঢুকে নিজেদের সর্বনাশ করছে—আর কতক নানা হীন উপায়ে জীবিকা-নির্বাহের চেষ্টা করছে। দেশে চুরি, ডাকাতি ও বলাৎকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বেগুন তিন আনা সের এবং মাছ কেন দেড় টাকা সের হয়, তাই লোকে জিজ্ঞাসা করে। যে খেতের মালিক বা মাছ ধরে, তার অবস্থা দিন দিন খারাপই হচ্ছে—জমিদার,

মহাজন, দালালের পেটেই লাভের বার আনা যাচ্ছে। কাজেই ক্রেতাকে দাম এত বেশি দিতে হচ্ছে।

জমিতে চাষির স্বত্ব নাই। যত্নের অভাবে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট হয়েছে। উৎপন্নে প্রজার লাভের পূর্ণ অংশ নাই। আমরা গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছি। কাউন্সিলে এবং খবরের কাগজে স্বরাজের জন্য চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছি। আবার বলছি স্বরাজ পেলে এই সমস্ত সমস্যা আপনিই দূর হবে।

এই 'স্বরাজ'টা এখন হলে পাবে কে? যারা পাবে তারা নিজের হাতে যেটুকু দেওয়ার ক্ষমতা এখনই আছে, তা সকলকে দিচ্ছে কি? আমরা স্বরাজের মামলা আর এটর্নি দিয়ে করতে চাই না—এবার নিজেদেরই বুঝতে হবে। মথুরার লীলা ঢের দেখেছি—আমাদের দেবতা যিনি তাঁকে বৃন্দাবনের শ্যামল মাঠে ফিরিয়ে আনতে চলেছি, তিনি রাখালগণের সখা, তিনি গোধন চরাতে ভালবাসেন। তিনি বেণু বাজিয়ে সকলকে পাগল করেন। যদি সেই দেবতার আবাহনে কেউ বাধা দেন, তবে আমাদের হলধর ঠাকুর তাঁকে রাখবেন না—লাঙলের আঘাতে তাঁকে মরতেই হবে।

'লাঙল' চালিয়ে যিনি সীতাকে লাভ করেছিলেন, সেই জনক আমাদের গুরু। যিনি Producer(জনক) তিনিই ঋষি। তিনিই সমাজের শ্রেষ্ঠ। আজ নবজনকের নূতন-দর্শনে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে হবে। Distributor হিসাবে জনকয়েক ভদ্রলোকের স্থান সমাজে আছে। ডাক্তারি, শিক্ষকতা প্রভৃতির দ্বারা সমাজের সেবা করার জন্যও লোকের প্রয়োজন। কবি চিত্রকর শিল্পী হিসাবেও স্রষ্টার স্থান আছে। কিন্তু পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার ব্যবসাটা লোপ পাওয়া দরকার। শরীরের মধ্যস্থল বেশি স্ফীত হয়ে গেল শরীরটাই অচল হয়ে পড়বে। দুম্বার লেজ শরীর অপেক্ষা বড় হলে তখন লেজের মাংস খেলে দুম্বারই উপকার।

হিন্দুর বর্ণবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিযোগিতাকে এড়িয়ে শ্রমবিভাগ-নীতি মেনে পুরুষানুক্রমে একই চর্চা করে সমাজের ক্রমোন্নতি এই পদ্ধতির মূলে ছিল। এখন কিন্তু তালগাছহীন তালপুকুর হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বর্ণ-বিভাগ।

ব্রাহ্মণ পাদরির রাজত্ব গিয়াছে। গুরু-পুরোহিত, খলিফা, পোপ নির্বংশ-প্রায়। ক্ষাত্র সম্রাট ও সাম্রাজ্য সব ধ্বসে পড়েছে। রাজা আছেন নামে মাত্র। আমেরিকা, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে এখন বৈশ্যের রাজত্ব। এবার শূদ্রের পালা। এবার সমাজের প্রয়োজনে শূদ্র নয়—শূদ্রের প্রয়োজনে সমাজ চলবে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সমস্যা সব লাঙলের ফালে মুখে লোপ পাবে। তাই আমরা লাঙলের জয়গান করলাম। লাঙল নবযুগের নব-দেবতা। জয় লাঙলের জয়—জয় লাঙলের দেবতার জয়॥

লাঙল
প্রথম খণ্ড, বিশেষ সংখ্যা
১লা বৈশাখ ১৩৩২

পোলিটিকাল তুবড়িবাজি

কানপুরে বড়দিনের ছুটিতে All India Political Tubri Competition হয়ে গেল। জাতির সমস্যা সমাধানের জন্য ৩০টি কনফারেন্স বসেছিল। নিখিল ভারতীয় প্রেত-তত্ত্ব সভা হতে আরম্ভ করে সোভিয়েট রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পর্যন্ত হয়ে গেছে। এই হট্টগোলের মধ্যে সুখের বিষয় শ্রমিক ও কৃষকের কথা সকলেই তুলেছেন। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী লাঙলের জয়গান করেছেন—

> 'The immemorial twin symbol of the plough and the spinning wheel is the central text of the teaching that shall liberate our unhappy peasantry from the crushing misery and terror of hunger, ignorance and disease.'

লাঙল এবং চরকাকে কেন্দ্র করে আমাদের পল্লি-সংগঠনের আয়োজন করতে হয়—লাঙলের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-স্বত্বের কথা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং ভূমি-স্বত্বের সঙ্গে ভারতীয় স্বরাজের প্রতিষ্ঠার এত নিকট-সম্বন্ধ যে সে সমস্যার সমাধান না হলে স্বরাজ আসতেই পারে না। তাই প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনার সময় সমস্ত নেতারা কি করেন, আমরা দেখবার জন্য উৎসুক আছি। যাঁরা বলেন স্বরাজ হলে ওসব ঠিক হবে—তাঁরা গোড়াতেই ভুল করেন।

সাম্যবাদী-দলের কনফারেন্সের সভাপতি শ্রীযুত শিঙ্গরভেলু ঠিকই বলেছেন যে, শ্রমিক ও কৃষকের সাহায্য ব্যতীত যে কংগ্রেস বলহীন এবং সে কংগ্রেসের দ্বারা স্বরাজ আসতে পারে না, তা গত পাঁচ বছরের আন্দোলনের ইতিহাসে প্রমাণ হয়ে গেছে। কেবল ১৯২১ সালে যখন শণ-ঐরাবত ত্যাগী রাজদুলাল মহাত্মাকে কাঁধে চড়িয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল, তখন লর্ড রেডিং বলেছিলেন, 'Let us as equals, forgiving and forgetting the past, in a round table conference to devise a constitution for India.' তখন সমানে সমানে কোলাকুলি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর এখন এসেমব্লির সামান্য প্রার্থনার জবাব দিতেও গবর্মেণ্ট প্রয়োজন বোধ করে না।

পণ্ডিত মতিলাল ভয় দেখিয়েছেন ফেব্রুয়ারির মধ্যে জবাব না দিলে স্বরাজীরা ব্যবস্থাপক সভা ত্যাগ করে সিন্ধু হতে ব্রহ্মপুত্র এবং কৈলাস হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তোলপাড় করবেন। তবে কাউন্সিলে পদগুলি যাতে শূন্য না হয়, কিংবা ফাঁকতালে আমলাতন্ত্র ট্যাক্স বাড়িয়ে না দেয়, সেজন্য সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হবেন। সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স শেষ অস্ত্র হবে—কিন্তু সেটা যখন করার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, তখন দেশকে তার জন্যে তৈরি করাই কাজ হবে। মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি direct action, আর বর্তমান কংগ্রেস-নীতির ভিত্তি constitutionalism—বিরোধ এইখানে, বিরোধ মতিলাল জয়াকর কেলকারে নয়। প্রথম জাতীয় নীতির মূলে শুধু জনসাধারণের সাহায্য চাই, দ্বিতীয় নীতির মূলে এই বুর্জোয়া ভদ্র-সম্প্রদায়ের হাত। যে শক্তি আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্য সঞ্চিত হয়েছিল, মহাত্মা বারদৌলিতে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাই আজ অভ্যন্তরিক বাদ-বিসংবাদে সেই শক্তির

অপপ্রয়োগ হচ্ছে। হিন্দু-মুসলিম, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, ধনিক-শ্রমিক, জমিদার-প্রজা, নোচেঞ্জার প্রো-চেঞ্জার, এই সমস্ত দলাদলির মূলে ঐ একই কারণ। সতীদেহ টুকরো টুকরো হয়ে আজ ভারতের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রুদ্রের এ রোষ কবে থামবে, জানি না।

কৃষক ও শ্রমিককে সঙ্ঘবদ্ধ না করে, তাদের প্রয়োজনে তাদের অধিকারে জনগণকে সচেতন না করে আর আমাদের লম্বা লম্বা কথা কওয়া উচিত নয়। পণ্ডিত মতিলালের মতলব দেশের লোককে চমক লাগিয়ে দিয়ে ফিরে ইলেকশনে আবার দল বেঁধে কাউন্সিলে প্রবেশ করা? কিন্তু অতঃপর? মহাত্মার এক বৎসরের স্বরাজের ধাক্কা এখনও আমরা সামলাতে পারিনি, আর চমক লাগানোর প্রয়োজন কি? পণ্ডিতজির রেজোলিউশন পড়ে আমাদের মনে হয় সেই লোকটার জলে ডোবার কথা। সে সংসার-জ্বালায় জ্বলেপুড়ে বিরক্ত হয়ে জলে ডুবে মরবে বলে ঠিক করল; কিন্তু ঘাটে যাওয়ার আগে গামছাখানি ও তেল চাইল। তেল-মাখা ও গামছার কথা যে না ভুলেছে, সে যে জলে ডুবে মরবে না এটা বেশ বোঝা যায়।

শুধু পোলিটিকাল তুবড়িবাজিতে কি হবে? কাগজে আমরা লিখতে পারি, দেশ কানপুরের দিকে চেয়ে আছে, Great speech, momentous session : কিন্তু এ-সবই অভিনয়ের শেষ রাত্রির বিজ্ঞাপনের মতো। দেশের জনসাধারণের মাথা কচ্ছপের মতো শরীরের ভিতর ঢুকে গেছে। এখন সেই মাথা বের করতে দেহটাকে কাটতে গেলে চলবে না। জলে ছেড়ে দিলেই সে আবার স্বচ্ছন্দভাব ধারণ করবে। প্রতিদিনের যে অভাবে সে এমন হয়ে মরছে, জনসাধারণকে সেই অভাবের প্রতিকারের মধ্য দিয়ে আবার সজাগ করতে হবে। সে কঠিন সাধনার তারিখ নাই; ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৩ বা ফেব্রুয়ারি শেষ ১৯২৬-এর ভিতর তাকে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না।

বৎসরান্তে কানপুরে আমাদের পোলিটিকাল চড়ক-পূজা শেষ হল। ফিরে এসে দুই-একজন বাদে নেতারা ওকালতি, ডাক্তারি, ব্যারিস্টারি এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে মন দিবেন এবং যিনি বড় দয়ালু তিনি সপ্তাহান্তে হয়তো একএকবার দেশ-উদ্ধারে মনোযোগ দিবেন। কই দেশবন্ধুর মতো সেই সর্বগ্রাসী দেশপ্রেম, কই সেই জ্বালা? আজ রাজনীতিক্ষেত্রে কেবল ফাঁকিবাজি, সঞ্চিত ধনের গাদায় বসে, অথবা পাবলিক ফাণ্ডের অপহরণে, অথবা প্রজার রক্ত শোষণ করে যে নিশ্চিন্ত আছে, আজ তারই নেতাগিরির দিন। যে সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের সেবা করে সে নিশ্চয়ই উপায়হীন, কিংবা গবর্মেন্টের টাকা খায়। স্বরাজ-সাধনার শক্তিবলে আয়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আজ লোভীর মধুচক্রে পরিণত, পোলিটিকাল মোহন্তের দল রাজনীতির পুণ্য তীর্থে যথেচ্ছভাবে দীপ্তমান। নন্দী ভৃঙ্গীর দল তাদের শিঙা বাজিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছে, শিবাদলের কোলাহলে শ্মশান-দেশ মুখরিত। ভগীরথের শঙ্খধ্বনি আর ত্যাগ-সুরধুনীকে মর্ত্যে নিয়ে আসছেন না,—'শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতিতে আজ রোগশোকে মুহ্যমান নিস্তব্ধ দেশকে প্রাণবান বলে প্রতিভাত করছে।

আজ এই শব-সাধনায় তরুণ বাংলার ডাক পড়েছে—এস ভাই, তোমাদের মরণজয়ী পণ আর একবার শক্তিপীঠ বাংলাকে পবিত্র করুক। নেতাদের স্তোকবাক্যে ভুলো না—তোমাদের কাঁধে চড়ে যাঁরা নিজেদের উঁচু দেখান, সিন্ধুবাদের নাবিকের সেই বোঝা ফেলে দাও। তুবড়িবাজি দেখে মুগ্ধ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থেকো না—তোমার দুর্গম অমানিশার পথে ওই আলো কেবল চোখে ধাঁধা লাগায়। একটা পিস্তল বা বোমার আওয়াজে তুমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িও না—ওর চেয়ে ঢের বড় শক্তি তোমার অপেক্ষায় সঞ্চিত হয়ে আছে, তুমি নবযুগের রামের মতো সেই শক্তিকে পাষাণী অহল্যার ন্যায় প্রাণের স্পর্শে মুক্তিদান করো! গণআন্দোলনের চলমান শক্তি এই নিরস্ত্রীকৃত প্রাণহীনের দেশে বিপ্লবের বন্যা এনে দিক, যুগান্তরের সঞ্চিত জঞ্জাল সব ভেসে যাক।

জড় জীব তাঁর চড়কে ঘুরিয়া হলো বেভুল
তথাপি পড়ে না পাগল শিবের মাথার ফুল!
বল সন্ন্যাসী, মুখ ফুটে বল,
কে কোথা ডুবিয়া খেয়েছিস জল?
রক্ত-নয়ন ডুবিছে তপন না পেয়ে কূল।
দিন যায়, কেন পড়ে না শিবের মাথার ফুল!

লাঙল
প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা,
২৩শে পৌষ ১৩৩২

'গণবাণী' ও মুজফফর আহমদ

[এই পত্রখানি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ দলের অন্যতম মুখপত্র সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক শ্রী গোপাললাল সান্যাল মহাশয়কে লিখিত। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২০শে আগস্ট সংখ্যা 'আত্মশক্তি' পত্রিকার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে শ্রী তারানাথ রায় 'তারা-রা' ছদ্মনামে বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের মুখপত্র 'গণবাণী'র সমালোচনা করেন। তারই জবাবে কবি এই পত্রটি লেখেন।]

শ্রীযুক্ত 'আত্মশক্তি' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন
আপনার (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের) ২০শে আগস্টের 'আত্মশক্তি'র 'পুস্তক-পরিচয়'-এ নতুন সাপ্তাহিক 'গণবাণী'র সাথে আমিও সংশ্লিষ্ট। অবশ্য 'গণবাণী' পুস্তক নয়, 'আত্মশক্তি'র পুস্তক-পরিচয়ের সুবিধা নিয়ে পরিচিত হলেও, যেমন আত্মশক্তি আপনার কাগজ হলেও, ঐ সমালোচনাটা আপনার নয়।

ঐ 'পরিচয়' নিয়ে বলবার কথাটুকু আমারই ব্যক্তিগত, আমাদের কৃষক শ্রমিক দলের নয়। আশা করি, আপনার ঢাউস কাগজের একটুখানি জায়গা ছেড়ে দেবেন আমার বক্তব্যটুকু জানাতে। এ অনুরোধ করলাম এই সাহসে যে, আপনার সম্পাদিত পত্রিকাটি 'শুক্রবারের আত্মশক্তি', 'শনিবারের পত্র' নয়। হঠাৎ এ কথাটা বলার হেতু আছে। কেউ বলছিলেন, 'শনিবারের চিঠি' না-কি একীভূত হয়ে উঠেছে 'আত্মশক্তির' সাথে। অবশ্য, আমার একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়নি, যদিও দু'তিনবারে আমার এইরূপ ভুল ধারণা করিয়ে দিয়েছেন আর কি। এরকম ধারণার আরও কারণ আছে। হঠাৎ একদিন কাগজে পড়লাম ইটালির মুসোলিনি আর আফ্রিকার হাবসি রাজার ইয়ার্কি চলতে চলতে শেষে কি একরকম সম্বন্ধ পাকতে চলেছে। সেই ইয়ার্কিটা গুজব যে, হাবসি দেশটা ইটালির সাথে একীভূত (Incorporated) হয়ে যাচ্ছে। হবেও বা। এত সাদা Vs অত কালোয়, অত শীত Vs গ্রীষ্মের যদি আঁতাত হতে পারে, তবে শনিবারের পত্র শুক্রবারের পত্রিকাতেই বা বন্ধুত্ব হবে না কেন, একীভূত না হোক। আমরা আদার ব্যাপারি অত সব জাহাজের খবর নেওয়া ধৃষ্টতা নিশ্চয়ই। তবে জানেন কি, 'খোশ খবরকা ঝুটা ভি আচ্ছা' বলে একটা প্রবাদ আছে, অর্থাৎ ওটাকে উলটিয়ে বললে ওর মানে হয় 'বুরা খবরকা সাচ্চা ভি না চা'। আপনার 'অরসিক রায়' এবং প্রবাসীর অশোকবাবুতে যখন কথা কাটাকাটি চলছিল তখন ওটা ইয়ার্কির মতো অত হালকা বোধ হয় নাই, যা দেখে আমরা আশা করতে পারতাম যে ওটা শিগগিরই একটা সম্বন্ধে পেকে উঠবে। 'ফরেন পলিসি' আমরা বুঝিনে, তবে আমার এক বন্ধু একদিন বলেছিলেন, এ লেখালেখির শিগগিরই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে, কেননা অশোকবাবুর লেখার ক্ষমতা না থাক, তাঁর ঘুষি লড়বার ক্ষমতা আছে।

চিন্তার বিষয়, সন্দেহ নেই। অশোকবাবুর লেখার কসরত দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু বক্সিং শিখলে যে শক্তিশালী লেখক হওয়া যায়, এ সন্ধান তো আগে আমায় কেউ দেননি। তাহলে আমি আমার লেখার কায়দাটা অশোকবাবুর কাছে দেখেই শিখতাম। আর অশোকবাবু ও তাঁর চেলাচামুণ্ডারা আমায় লিখতে শেখাবার জন্য কিরূপ সমুৎসুক, তা তাঁদের আমার উদ্দেশ্য বহু অর্থব্যয়ে ছাপা বিশেষ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'গুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন। বাগ্‌দেবী যে আজকাল বাগ্‌দিনী হয়ে বীণা ফেলে সজনে কাঠের ঠেঙ্গা বাজাচ্ছেন, তাও দেখতে পাবেন।

আপনাকে আমি চিনি, তাই আমার ভয় হচ্ছিল আপনার কাগজের ইদানীং লেখাগুলো দেখে যে,কোনোদিন বা আপনারও নামের শেষে (B.A. Cantab) দেখে ফেলি। চিঠি মাত্রেই প্রাইভেট, এ কথা নীতিবিদ রামানন্দবাবুর বাড়ি থেকে প্রকাশিত না হলে কেউ কি বিশ্বাস করতে পারতেন? ও-রকম লেখা ঐরকম Oxen বা Cantab B.A. ইউরোপ-প্রত্যাগত অতিসভ্য ছাড়া বোধ হয় কেউ লিখতে তো পারেনই না, পড়তেও পারেন না। অশোকবনের চেড়ির মার সীতার প্রতি কিরূপ মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল জানা নেই। কিন্তু সে মার সরস্বতীর ওপর পড়লে যে কিরূপ মারাত্মক হয়, তা বেশ বুঝছি। আমার ভয় হচ্ছে, কোনোদিন বা শ্রীযুক্ত বলাই চাটুজ্জে লেখা শুরু করে দেন।

শিবের গীত গাইতে ধান ভেনে নিলাম দেখে ('ধান ভানতে শিবের গীত' নয়) আপনি হয়তো অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, কিন্তু আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে এটা চিঠি, প্রবন্ধ নয়। আর, চিঠিতে যে আবোল-তাবোল বকবার অধিকার সকলেরই আছে, তা 'শনিবারের চিঠি' পড়লেই দেখতে পাবেন। তাই বলে আমার এ চিঠিটা রবিবারের উত্তরও নয়। কেননা তাঁরা এত চিঠি লিখেছেন আমায় যে, তার উত্তর দিতে হলে আবার গণেশ ঠাকুরকে ডাকতে হয়। এটাকে মনে করে নিন আসল গান গাইবার আগে একটু তারারা করে নেওয়া, যেমন আপনারা তারারা করেছেন গণবাণীর আলোচনা করতে গিয়ে।

শ্রীযুক্ত তারারা লিখেছেন 'লাঙল উঠে গিয়ে এটা (অর্থাৎ গণবাণী) নামাল।' কিন্তু 'গণবাণী'র কভারে লেখা আছে, এর সাথে 'লাঙল' একীভূত হয়েছে। যেমন Forword-এর সাথে Indian Daily News প্রভৃতি একীভূত হয়েছে। অতএব আসলে লাঙল উঠে গেল না, সে রয়ে গেল গণবাণীর মধ্যে। এর কারণও দেখিয়েছেন ওর সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহমদ। 'গণবাণী'র কভারের লেখাটুকু বোধ হয় শ্রীযুক্ত তারারা চোখে পড়ে নাই। অবশ্য আমি এ ইচ্ছা করছি না যে, তার চোখে লাঙল পড়ুক। চোখে খড়কুটো পড়লেই যে রকম অবস্থা হয়ে উঠে!

তিনি আরো লিখেছেন, এ নামের দল (বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দল) এদেশে কবে তৈরি হলো, কারা করল, কোনো ভাতকাপড়ের সংস্থানহীন অনশন-অর্ধাশনক্লিষ্ট শ্রমিকরা এর কর্ণধার তা সাধারণকে জানানো উচিত। কোনো সাধারণ সভায় এর উদ্বোধন, সেটাও জানানো দরকার। 'শ্রীযুক্ত তারারা' 'দরিয়াপারে' খবর লেখেন, অনেক কাগজে অনেক রকম কিছু লেখেন, সুতরাং দরিয়ার এপারের দেশি খবরটাও তিনি রাখেন এ বিশ্বাস করা অপরাধের নয় নিশ্চয়। কিন্তু না রাখাটা অপরাধের, অন্তত তাঁর পক্ষে যিনি রাজনীতি আলোচনা করেন। তিনি আপাতত আপনার কাগজে কৃষক-শ্রমিকের খবরাখবর করলেও আগে নিশ্চয় করতেন না। নইলে তিনি ও-রকম প্রশ্ন করে নিজেকে লজ্জায় ফেলতেন না। 'বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল' সম্বন্ধে দু'-একটা খবর দিচ্ছি ওঁকে, ওঁর ওগুলো জানা থাকলে কাজে লাগবে। গত ফেব্রুয়ারি মাঝের ৬ই ও ৭ই তারিখে কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়, যার সভাপতি হয়েছিলেন ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ঐ কনফারেন্সের বিবরণী বাংলার ইংরাজি-বাংলা প্রায় সব কাগজেই বেরিয়েছিল। লাঙলে তো বেরিয়েছিলই। অবশ্য ধনিকদলের কাগজ 'ফরওয়ার্ড' সে বিবরণ ছাপায়নি—শুধু সভার সংবাদটুকু কোনো নারীহরণের মামলার শেষে দেওয়া ছাড়া। এর পর এলবার্ট হল প্রভৃতি স্থানে বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের যতগুলো সভাসমিতি হয়েছে, তার কোনো সংবাদই ছাপেনি 'ফরওয়ার্ড'। আমরা দিয়ে আসলেও না। সম্পাদকীয় এই ধর্ম ও সৌজন্যটুকু বাংলার আর কোনো কাগজ অতিক্রম করেনি। অবশ্যই 'ফরওয়ার্ড' বিলেতের ও জগতের আরো আরো দেশের শ্রমিকদের কথা লেখে, সুতরাং ও-কাগজে বাংলার জঘন্য চাষি-মজুরের কথাও লিখতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তাতে আবার এ কৃষক-শ্রমিক দলটা তুলসীবাবুর, নলিনীবাবুর মতো

ধনিক নেতার দ্বারা গঠিত নয়। গঠন করলে কারা, না, যত সব বিভিন্ন জেলার সত্যিকারের মজুর, ক্ষয়কেশো হাড়-চামড়া বের করা, আধ-ন্যাংটা বেগুন-সিদ্ধ মতো মুখওয়ালা চাষা-মজুর। আর তাদের নেতাগুলোও তদ্রূপ—না আছে চাল না আছে চুলো। তাতে বলশেভিক ষড়যন্ত্রের আসামি সব। বোঝো ঠ্যালা!

যাক, ঐ প্রজা সম্মিলনের প্রস্তাবসমূহ নবম সংখ্যা লাঙলে বেরিয়েছিল। ঐ সম্মিলনের প্রথম প্রস্তাবই হচ্ছে কৃষক-শ্রমিক দল গঠনের প্রস্তাব।

উহার চতুর্থ প্রস্তাব হচ্ছে : 'লাঙল পত্রিকাকে কৃষক ও শ্রমিকদের মুখপত্ররূপে আপাতত গ্রহণ করা হউক।'

প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবক ও সমর্থক সকলেই বিভিন্ন জেলার কৃষক ও শ্রমিক।

অরপর তারারার সঙ্গিন প্রশ্ন—'কোনো কোনো ভাত-কাপড়ের সংস্থানহীন অনশন-অর্ধাশনক্লিষ্ট শ্রমিকেরা এর কর্ণধার।' উত্তরে তারারা মহাশয়কে সানুনয় অনুরোধ জানাচ্ছি তিনি যেন দয়া করে একবার ৩৭ হ্যারিসন রোডের 'গণবাণী' অফিসে পদধূলি দিয়ে যান। গেলে দেখতে পাবেন, বহু হতভাগ্যের পদধূলি 'গণবাণী' অফিসে স্তূপীকৃত হয়ে 'গণবাণী'-কেও ছাড়িয়ে উঠেছে? সে অফিসে মাদুরের চেয়ে মেঝেই বেশি, চেয়ার টেবিল তো নঞতৎপুরুষ সমাস। মানুষগুলির অধিকাংশই মদ্যপদলোপী কর্মধারয়। অবশ্য খাবার বেলায় বহুব্রীহি। বাজপড়া, মাথা-ন্যাড়া তালগাছের মতো সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে চোখে জল আসে, বিশেষ করে যখন দেখি, 'গণবাণী'র কর্ণধার হতভাগ্য মুজফফর আহমদকে। অবস্থা তো সব—'ফকির-ফোকরা, হাঁড়িতে ভাত নেই, শানকিতে ঠোকরা।' আর শরীরের অবস্থা তেমনি। যেন সমগ্র মানবসমাজের প্রতিবাদ! আমি হলফ করে বলতে পারি মুজফফরকে দেখলে লোকের শুষ্ক চক্ষু ফেটেও জল আসবে। এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌন কর্মী, এমন সুন্দর প্রাণ, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা—সবচেয়ে এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কি করে জন্মাল গোঁড়া মৌলবির দেশে নোয়াখালিতে, এই মোল্লা-মৌলবির দেশ বাংলায়, তা ভেবে পাইনে। ও যেন আগুনের শিখা, ওকে মেরে নিবৃত্ত করা যায় না। ও যেন পোকায় কাটা ফুল, পোকায় কাটছে তবু সুগন্ধ দিচ্ছে। আজ তাকে যক্ষ্মা খেয়ে ফেলেছে, আর কটা দিন সে বাঁচবে জানি না। ওর পায়ের তলায় বসে শিষ্যত্ব করতে পারে না, এমন অনেক মুসলমান নেতা আজ এই সাম্প্রদায়িক হুড়োহুড়ির ও যুগের হুজুগের সুবিধে নিয়ে গুছিয়ে নিলে, শুধু মুজফফর দিনের পর দিন অর্ধাশন অনশনে ক্লিষ্ট হয়ে শুকিয়ে মরছে। আমি জানি, এই 'গণবাণী' বের করতে তাকে দুটো দিন কাঠে কাঠ অনশনে কাটাতে হয়েছে। বুদ্ধু মিঞাও আজ লিডার, আর মুজফফর মরছে রক্তবমন করে। অথচ মুজফফরের মতো সমগ্রভাবে নেশনকে ভালবাসতে, ভারতবর্ষকে ভালবাসতে কোনো মুসলমান নেতা দূরের কথা, হিন্দু নেতাকেও দেখিনি। এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দিনে যদি কারুর মাথা ঠিক থাকে, তা মুজফফরের, 'লাঙল' ও 'গণবাণী'র লেখা প্রবন্ধ পড়লেই বুঝতে পারবেন।

দেশের ছোট বড় মাঝারি সকল দেশপ্রেমিক মিলে যখন 'এই বেলা নে ঘর ছেয়ে' প্রবাদটার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করে পনর দিন বিনাশ্রমে জেল বাসের বিনিময়ে অন্তত একশত টাকার 'ভাত কাপড়ের সংস্থান' করে নিলে, তখন যারা তাদের ত্যাগের মহিমাকে মলিন করল না আত্মবিক্রয়ের অর্থ দিয়ে—তাদের অন্যতম হচ্ছে মুজফফর। মুজফফর কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র কেসের দণ্ডভোগী অন্যতম আসামি এবং বাংলার সর্বপ্রথম মুসলমান স্টেট প্রিজনার! বাংলার বাইরে নানান খোট্টাই জেলে তার উপর অকথ্য অত্যাচার চলেছে। শেষে যখন যক্ষ্মায় সে মৃতপ্রায় তখন তাকে হিমালয় পর্বতস্থিত আলমোড়ায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন ওজন তার মাত্র ৭৪ পাউন্ড! সেখানে দিনের পর দিন কাটিয়েছে সে অনশনে, তবু সে চায়নি কিছু। সে বলেনি কোনোদিনই মুখ ফুটে যে, দেশের জন্য সে কিছু করেছে। বলবেও না ভবিষ্যতে। সে বলে না বলেই তো তার জন্য এত কান্না পায়, তার ওপর আমার এত বিপুল শ্রদ্ধা। সেই নেতা যিনি আজ কর্পোরেশনের মোটরে চড়ে দাড়িতে মলয় হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং ব্যাঙ্কে যাঁর জমার অঙ্কের ডান দিকের শূন্যটা বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন, যাঁকে কলকাতা এনে তাঁর টাউন হলের অভিভাষণ লিখিয়ে দিয়ে কাগজে কাগজে তাঁর নামে কীর্তন গেয়ে বড় করে তুলল সেই মুজফফর তার অতি বড় দুর্দিনে একটা পয়সা বা এক ফোঁটা সহানুভূতি পায়নি ঐ লিডার সাহেবের কাছে। সে অনুযোগ করে না তার জন্য, কিন্তু আমরা করি।

যে মুসলমান সাহিত্য-সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল মুজফফর, অথচ তার নিজের নাম চিরকাল গোপন রেখে গেল, সেই মুসলমান সাহিত্য-সমিতির যখন নতুন করে প্রতিষ্ঠা হলো এবং তার নতুন সভ্যগণ মুজফফর রাজলাঞ্ছিত বলে এবং তাদের অধিকাংশই রাজভৃত্য বলে যখন তার বন্দি বা মুক্ত হওয়ার জন্য নাম পর্যন্ত নিলে না—তার ঋণের কৃতজ্ঞতা স্বীকার তো দূরের কথা তখন একটি কথা কয়ে দুঃখ প্রকাশ করেনি মুজফফর। ও যেন প্রদীপের তেল, ওকে কেউ দেখলে না, দেখলে শুধু সেই শিখাকে, যা জ্বলে প্রদীপের তেলকে শোষণ করে। শুধু মুজফফর নয়, এ দলের প্রায় সকলেরই এই অবস্থা। হালিম, নলিনী, সব সমান। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখো। একজনের অ্যাপেন্ডিসাইটিস, একজনের ক্যানসার, ম্যালেরিয়া, একজনের আলসার, একজনের ধরেছে বাতে। আর হাড়হাভাতে ও হাভাতে তো সবাই। যাকে বলে নরক গুলজার, বলতে হলে সব শ্রীচরণ মাঝি ভরসা। কোমরের নিচে টাকা জুটাল না কারুর, আর পেটের ভিতর সর্বদা যেন বোমা তৈরি হচ্ছে—খিদের চোটে এমন হুড়মুড় করে। দিনরাত চুপসে আছে—বাতাস বেরিয়ে যাওয়া ফুটবলের ব্লাডারের মতো। চায়ের কাপগুলো অধিকাংশ সময়েই দস্ত 'ক্লাইভ স্ট্রিট' করে পড়ে আছেন। লেখককে তাঁর ইলেকট্রিক ফ্যান শীতলিত এবং লাইট উজ্জ্বলিত, ড্রয়ার টেবিল ডেস্ক পরিশোভিত, দারোয়ান দণ্ডায়িত, ত্রিতল অফিসকে ত্যাগ করে একটু নিচে নেমে (লিফট দিয়ে) তাঁদের অফিসের মোটরে করে আমাদের 'গণবাণী' অফিসের ও তার কর্ণধারদের দেখে যাবার নিমন্ত্রণ রইল। বুভুক্ষুগুলো অন্তত তাঁর পয়সায় একটু চা খেয়ে নেবে। অবশ্য ওকেও এক কাপ দেবে। আমি নিজে গিয়েই শ্রীযুক্ত 'তারারা'কে নিয়ে যেতাম, কিন্তু

এদিকেও ভাঁড়ে ভবানী। কয়েকদিন, কলকাতায় যাবার বিশেষ প্রয়োজন থাকলেও যেতে পারছিনে ট্রেন ভাড়ার অভাবে। বাড়ির হাঁড়িতে ইঁদুরেরা বক্সিং খেলছে, ডন খেলছে! ক্যাপিটালিস্টরা আমার চেয়েও সেয়ানা, তারা বলে 'হাত বুলাতে হয়, গায়ে বুলোও বাবা, মাথায় নয়, তোমার হাত খরচটা মিলে যাবে, কিন্তু ও কর্মটা হবে না দাদা। এমনকি মুজফফরের মতো সুঁটকি হয়ে মরো-মরো হলেও না।'

তারপর 'গণবাণী'র লেখা নিয়ে 'তারারা' বলেছেন—'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকেরা লেখাপড়ার সঙ্গে গোটা কয়েক মতবাদ শিখলে ওগুলো শিগগিরই বুঝতে পারবেন?'—তাঁর ইঙ্গিতটা এবং রসিকতাটা দুটোই বুঝলাম না, বুঝলাম শুধু তাঁর জানাশোনা কতটুকু—অন্তত সেই সম্বন্ধে, যে সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি কি জানেন না যে, কোনো দেশের কোনো শ্রমিক কার্ল মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' পড়ে বুঝতে পারবে না। ঐ মতবাদটা যারা পড়বে, তারা কৃষক-শ্রমিক নয়, তারা লেনিন ল্যান্সব্যারির নমুনার লোক। কার্ল মার্ক্সের মতবাদ সাধারণ শ্রমিক বুঝতে না পারলেও তা দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এ মতবাদ দিয়ে এমন কতকগুলি লোকের সৃষ্টি হয়েছে যারা জগৎটাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে গড়তে চাচ্ছেন বা গড়ছেন। মতবাদ কোনোকালেই জনসাধারণ বুঝবে না, মতবাদ তৈরি করে তুলবে সেই রকম লোক যারা বোঝাবেন এ মতবাদের মর্ম জনসাধারণকে। ইন্‌জিন চালাবে ড্রাইভার কিন্তু গাড়িতে চড়বে সর্বসাধারণ। 'গণবাণী'ও কৃষক শ্রমিকের পড়ার জন্য নয়, কৃষক-শ্রমিকদের গড়ে তুলবেন যাঁরা—'গণবাণী' তাঁদেরই জন্য। কৃষক-শ্রমিক দলের মুখপত্র, মানে তাদের বেদনাতুর হৃদয়ের মূক মুখের বাণী 'গণবাণী' ও তাদের বইতে না পারা ব্যথা কথায় ফুটিয়ে তুলবে 'গণবাণী'। ইতি—

৮ই ভাদ্র
১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

বিনীত
নজরুল ইসলাম

বাঙালির বাংলা

বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে 'বাঙালির বাংলা'—সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালিই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালির মতো জ্ঞানশক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্মশক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্মবিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনাশক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তম, এই তিমির, এই জড়ত্বই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল

অন্ধকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায়; দিব্যশক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে। যারা যত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, এই অবিদ্যা তাদেরই তত বাধা দেয়—বিঘ্ন আনে। এই জড়তা মানবকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। কিছুতেই অমৃতের পানে আনন্দের পথে যেতে দেয় না। এই তমকে শাসন করতে পারে একমাত্র রজগুণ, অর্থাৎ ক্ষাত্রশক্তি। এই ক্ষাত্রশক্তিকে না জাগালে মানুষের মাঝে যে বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মশক্তি আছে, তা তাকে তমগুণের নরকে টেনে এনে প্রায় সংহার করে ফেলে। বাঙালি আজন্ম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। তাদের ক্ষাত্রশক্তি জাগল না বলে দিব্যশক্তি কোনো কাজে লাগল না—বাঙালির চন্দ্রনাথের আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্‌গিরণ করল না। এই ক্ষাত্রশক্তিই দিব্য তেজ। প্রত্যেক মানুষই ত্রিগুণান্বিত। সত্ব, রজ ও তম এই তিনগুণ। সত্বগুণ, ঐশীশক্তি অর্থাৎ সৎশক্তি সর্ব অসৎ শক্তিকে পরাজিত করে পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। এই সত্ব গুণের প্রধান শত্রু তম গুণকে প্রবল ক্ষাত্রশক্তি দমন করে। অর্থাৎ আলস্য, কর্মবিমুখতা, পঙ্গুত্ব আসতে দেয় না। দেহ ও মনকে কর্মসুন্দর করে। জীবনশক্তিকে চিরজাগ্রত রাখে, যৌবনকে নিত্য তেজপ্রদীপ্ত করে রাখে। নৈরাশ্য, অবিশ্বাস, জরা, ও ক্লৈব্যকে আসতে দেয় না। বাঙালির মস্তিষ্ক ও হৃদয় ব্রহ্মময় কিন্তু দেহ ও মন পাষাণময়। কাজেই এই বাংলার অন্তরে-বাহিরে যে ঐশ্বর্য পরম দাতা আমাদের দিয়েছেন, আমরা তাকে অবহেলা করে ঋণে, অভাবে, দৈন্যে, ব্যাধিতে, দুর্দশায় জড়িয়ে পড়েছি। বাংলার শিয়রে প্রহরীর মতো জেগে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গিরি হিমালয়। এই হিমালয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষি-যোগীরা সাধনা করেছেন। এই হিমালয়কে তাঁরা সর্ব দৈবশক্তির লীলানিকেতন বলেছেন। এই হিমালয়ের গভীর হৃদগুহার অনন্ত স্নেহধারা বাংলার শত শত নদ-নদী রূপে আমাদের মাঠে-ঘাটে ঝরে পড়েছে। বাংলার সূর্য অতি তীব্র দহনে দাহন করে না। বাংলার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধ। বাংলার আকাশ নিত্য প্রসন্ন, বাংলার বায়ুতে চিরবসন্ত ও শরতের নিত্য মাধুর্য ও শ্রী। বাংলার জল নিত্য প্রাচুর্যে ও শুদ্ধতায় পূর্ণ। বাংলার মাটি নিত্যউর্বর। এই মাটিতে নিত্য সোনা ফলে। এত ধান আর কোনো দেশে ফলে না। পাট শুধু একা বাংলার। পৃথিবীর আর কোনো দেশে পাট উৎপন্ন হয় না। এত ফুল, এত পাখি, এত গান, এত সুর, এত কুঞ্জ, এত ছায়া, এত মায়া আর কোথাও নেই। এত আনন্দ, এত হুল্লোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এত ধর্মবোধ—আল্লাহ-ভগবানের উপাসনা, উপবাস-উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাংলার কয়লা অপরিমাণ, তা কখনো ফুরাবে না। বাংলার সুবর্ণ-রেখার বালিতে পানিতে স্বর্ণরেণু। বাংলার অভাব কোথায়? বাংলার মাঠে মাঠে ধেনু, ছাগ, মহিষ। নদীতে ঝিলে বিলে পুকুরে ডোবায় প্রয়োজনের অধিক মাছ। আমাদের মাতৃভূমি পৃথিবীর স্বর্গ, নিত্য সর্বৈশ্বর্যময়ী। আমাদের অভাব কোথায়? অতি প্রাচুর্য আমাদের বিলাসী, ভোগী করে শেষে অলস, কর্মবিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের মাছ ধান পাট, আমাদের ঐশ্বর্য শত বিদেশি লুটে নিয়ে যায়, আমরা তার প্রতিবাদ করি না, উলটো, তাদের দাসত্ব করি; এ লুণ্ঠনে তাদের সাহায্য করি।

বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজো বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ-লেখায় লিখিত। বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান। হেথায় লক্ষ লক্ষ যোগী মুনি ঋষি তপস্বীর পীঠস্থান, সমাধি ; সহস্র সহস্র ফকির-দরবেশ ওলি-গাজির দরগা পরম পবিত্র। হেথায় গ্রামে হয় আজানের সাথে শঙ্খ ঘন্টার ধ্বনি। এখানে যে শাসনকর্তা হয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতামন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।

আজ আমাদের আলস্যের, কর্মবিমুখতার পৌরুষের অভাবেই আমরা হয়ে আছি সকলের চেয়ে দীন। যে বাঙালি সারা পৃথিবীর লোককে দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারত আরাই আজ হচ্ছে সকলের দ্বারে ভিখারি। যারা ঘরের পাশে পাহাড়ের অজগর বনের বাঘ নিয়ে বাস করে, তারা আজ নিরক্ষর বিদেশির দাসত্ব করে। শুনে ভীষণ ক্রোধে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে, সারা দেহমনে আসে প্রলয়ের কম্পন, সারা বক্ষ মন্থন করে আসে অশ্রুজল। যাদের মাথায় নিত্য স্নিগ্ধ মেঘ ছায়া হয়ে সঞ্চরণ করে ফিরে, ঐশী আশীর্বাদ অজস্র বৃষ্টিধারায় ঝরে পড়ে, শ্যামায়মান অরণ্য যাকে দেয় স্নিগ্ধ-শান্তশ্রী, বজ্রের বিদ্যুৎ দেখে যারা নেচে উঠে,—হায় তারা এই অপমান এই দাসত্ব বিদেশি দস্যুদের এই উপদ্রব নির্যাতনকে কি করে সহ্য করে? ঐশী ঐশ্বর্য—যা আমাদের পথে ঘাটে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে আছে তাকে বিসর্জন করে অর্জন করেছি এই দৈন্য, দারিদ্র্য, অভাব, লাঞ্ছনা। বাঙালি সৈনিক হতে পারল না। ক্ষাত্র শক্তিকে অবহেলা করল বলে তার এই দুর্গতি—তার অভিশপ্তের জীবন। তার মাঠের ধান পাট রবিফসল তার সোনা তামা লোহা কয়লা—তার সর্ব ঐশ্বর্য বিদেশি দস্যু বাটপাড়ি করে ডাকাতি করে নিয়ে যায়, সে বসে বসে দেখে। বলতে পারে না 'এ আমাদের ভগবানের দান, এ আমাদের মাতৃ-ঐশ্বর্য ! খবরদার, যে রাক্ষস একে গ্রাস করতে আসবে, যে দস্যু এ ঐশ্বর্য স্পর্শ করবে—তাকে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' দিয়ে বিনাশ করব, সংহার করব।'

বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও :

'এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির—আমাদের।
দিয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশি দস্যু ডাকাত
'রামা'দের 'গামা'দের।'

বাংলা বাঙালির হোক ! বাংলার জয় হোক ! বাঙালির জয় হোক।

নবযুগ
৩রা বৈশাখ, ১৩৪৯

মিয়া কা সারং

ইহা কাফি ঠাটের অন্তর্গত। ইহাকে তানসেনের ঘরের রাগিণী বলে। ইহাও এক প্রকার সারং। ইহার রেখাব স্পষ্ট। উদারার মুদারা গ্রামের এই রাগিণী অত্যন্ত সুখশ্রাব্য হয়। উদারা গ্রামে যেখানে নিখাদ ও ধৈবতের সঙ্গত হয় সেখানে কতকটা মিয়া কি মল্লারের মতো শোনায়। গুণী মাত্রেই জানেন যে, তানসেনের আয়ত্তাধীন ও প্রিয় রাগিণী ছিল কানাড়া। এই জন্য অনেকের মতে এই সারঙেও কতকটা কানাড়ার ছাড়া আসা উচিত এবং আসেও। এই সব রাগিণী মুসলমান রাজত্বের সময় গুণী ওস্তাদগণের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

দুটি রাগিণী

[বেণুকা ও দোলন চাঁপা]

'বেণুকা' ও 'দোলন চাঁপা' দুটি রাগিণীই আমার সৃষ্টি। আধুনিক (মডার্ণ) গানের সুরের মধ্যে আমি যে অভাবটি সবচেয়ে বেশি অনুভব করি তা হচ্ছে 'সিমিট্রি' (সামঞ্জস্য) বা 'ইউনিফরমিটি'র (সমতা) অভাব। কোনো রাগ বা রাগিণীর সঙ্গে অন্য রাগ বা রাগিণীর মিশ্রণ ঘটাতে হলে সঙ্গীত-শাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান বা রসবোধের প্রয়োজন তার অভাব আজকালকার অধিকাংশ গানের সুরের মধ্যেই লক্ষ করা যাচ্ছে এবং ঠিক এই কারণেই আমার নতুন রাগ-রাগিণী উদ্ধারের প্রচেষ্টা। রাগ-রাগিণী যদি তার 'গ্রহ' ও 'ন্যাস' এবং বাদী, বিবাদী ও সংবাদী মেনে নিয়ে সেই রাস্তায় চলে তাহলে তাতে কখনো সুরের সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হবে না।

ক্লাসিক্যাল ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যে অভিনব রস সৃষ্টি হতে পারে, মানুষের মনকে 'মহতে মহীয়ান' করতে পারে, তা আধুনিক সুরের একঘেয়ে চপলতায় সম্ভব হতে পারে না। আর যাঁরা মনে করেন হিন্দি ছাড়া বাংলা ভাষায় খেয়াল ধ্রুপদ ইত্যাদি গান হতে পারে না, আমার এই গান দুটির স্বর-সমাবেশ ও তালের, লয়ের ও ছন্দের 'কর্তব্য' তাদের সে ধারণা বদলে দেবে। গানের 'আঙ্গিক' বা মিউজিক্যাল টেকনিক বজায় রেখেও এই শ্রেণির গান কত মধুর হতে পারে, আশা করি, আমার এই গান দুটিই তা প্রমাণ করবে।

সুর : বেণুকা/তেতালা

'বেণুকা ওকে বাজায় মহুয়া-বনে
কেন ঝড় তোলে তার সুর আমার মনে।'

সুর : দোলন-চাঁপা/তেতালা

'দোলন-চাঁপা বনে দোলে
দোল-পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে,
শ্যাম পল্লব-কোলে যেন দোলে রাধা
লতার দোলনাতে।'

হোসেনী কানাড়া

কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী। এই রাগিণীও নূতন সৃষ্টি। কবি আমির খসরু এই রাগিণীর স্রষ্টা বলিয়া কথিত আছে। এই রাগিণীও প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থে নাই। যেমন আড়ানা মধ্যম হইতে আরম্ভ করিয়া গাহিতে হয় তেমনি হোসেনী কানাড়ারও গ্রহ সুর মধ্যম। আড়ানা হইতেই হাতে কানাড়ার অঙ্গ বেশি। আড়ানা, মেঘ, হোসেনী, সাহানা, সুহা, সুঘরাই, সুর মল্লার—(এইসব) রাগিণীতে সারদের অঙ্গ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহাতে কিন্তু কানাড়ার অঙ্গই প্রধান হইয়া ওঠে। তারার ষড়জ—ইহার চমৎকারিত্বের অন্যতম সহায়ক। ধৈবত গান্ধারের ব্যবহারের বিশেষ প্রণালিই (অধিকন্তু বা স্বল্পত) এই রাগিণীকে কানাড়া জাতীয় অন্য রাগিণী হইতে পৃথক করে। 'রাগ-লক্ষণ' গ্রন্থে হোসেনী কানাড়ার আরোহী সম্পূর্ণ ও অবরোহীতে নিখাদ বর্জিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

নীলাম্বরী

'নীলাম্বরী' কাফি ঠাটের খাড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। পঞ্চমবাদী—এই রাগিণীতে ষড়জ পঞ্চমের সঙ্গীত থাকে। গান্ধার কম্পিত :—ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য। পণ্ডিতগণ বলেন, ইহার আরোহীতে ধৈবত বর্জিত করিয়া গাহিতে হয়। ইহার আরোহীতে বহু গুণী গায়ক তীব্র গান্ধারও লাগাইয়া থাকেন। যদি ঠিকভাবে তীব্র গান্ধার লাগানো যায়, তাহা হইলে ইহার রূপ বিকৃত হয় না। মধুমতি ও ভীমপলাশীর মিশ্রণে এই রাগিণীর উৎপত্তি। এ রাগিণী প্রায় অপ্রচলিত।

আরোহী :— সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা
অবরোহী : —র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা।
লক্ষণ গীত—তেওড়া (দ্রুত লয়)

আমার লীগ কংগ্রেস

আমার স্বধর্মী কোনো কোনো ভাই বা তাঁদের কাগজ প্রচার করছেন—আমি নাকি মুসলিম লীগ বিদ্বেষী। বিদ্বেষ আমার ধর্ম-বিরুদ্ধ। আমার আল্লাহ নিত্য-পূর্ণ-পরম-অভেদ, নিত্য পরম-প্রেমময়, নিত্য সর্বদ্বন্দ্বাতীত। কোনো ধর্ম, কোনো জাতি বা মানবের প্রতি বিদ্বেষ আমার ধর্মে নাই, কর্মে নাই, মর্মে নাই। মানুষের বিচারকে আমি স্বীকারও করি না, ভয়ও করি না। আমি শুধু একমাত্র পরম বিচারক আল্লাহ ও তাঁর বিচারকেই মানি। তবু যাঁরা ভ্রান্ত বা বিদ্বেষবশত আমার এই নিন্দাবাদ করছেন তাঁদের ও আমার প্রিয় মুসলিম জনগণের অবগতির জন্য আমার সত্য অভিমত নিবেদন করছি।

আমি 'নবযুগে' যোগদান করেছি, শুধু ভারতে নয়, জগতে, নবযুগ আনার জন্য। এ আমার অহংকার নয়, এ আমার সাধ, এ আমার সাধনা। এই বিদ্বেষ-কলহ-কলঙ্কিত, প্রেমহীন, ক্ষমাহীন অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে, শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে—আল্লার বান্দা রূপেই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি। 'ইসলাম' ধর্ম এসেছে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে—কোরান মজিদে এই মহাবাণীই উত্থিত হয়েছে। ... এক আল্লাহ ছাড়া আমার কেউ প্রভু নাই। তাঁর আদেশ পালন করাই আমার একমাত্র মানবধর্ম। আমি যদি আমার অতীত জীবনে কোনো 'কফুর' বা 'গুনাহ' করে থাকি তার শাস্তি আমি আমার প্রভু আল্লার কাছ থেকে নেবো, তার শাস্তি কোনো মানুষের দেওয়ার অধিকার নাই। আল্লাহ লা-শরিক, একমেবাদ্বিতীয়ম। কে সেখানে 'দ্বিতীয়' আছে যে আমার বিচার করবে? কাজেই কারও নিন্দাবাদ বা বিচারকে আমি ভয় করি না। আল্লাহ আমার প্রভু, রসুলের আমি উম্মত, আল-কোরান আমার পথ-প্রদর্শক।

এ ছাড়া আমার কেহ প্রভু নাই, শাফায়ত দাতা নাই, মুর্শিদ নাই। আমার আল্লাহ আল ফাদালিল আজিম—পরম দাতা। তিনিই আমাকে জাতির কাছ থেকে, কৌমের কাছ থেকে, কোনো দান নিতে দেননি। যে দক্ষিণ হাত তুলে কেবল তার কৃপা ভিক্ষা করেছি তাঁর দাক্ষিণ্য ছাড়া কারুর দানে সে-হাত কলঙ্কিত হয়নি। আজ তিনিই এই পথভ্রষ্ট, অন্ধ আশ্রয়-ভিক্ষুকের হাত ধরে একমাত্র তাঁর পথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি আমার ক্ষমাসুন্দর আল্লার পূর্ণ ক্ষমা পেয়েছি, সত্য পথের সন্ধান পেয়েছি। তাঁর বান্দা হবার অধিকার পেয়েছি। আমার আজ আর কোনো অভাব নাই, চাওয়া নাই, পাওয়া নাই।

আমার কবিতা আমার শক্তি নয়; আল্লার দেওয়া শক্তি—আমি উপলক্ষ মাত্র! বীণার বেণুতে সুর বাজে কিন্তু বাজান যে-গুণী, সমস্ত প্রশংসা তারই। আমার কবিতা যাঁরা পড়ছেন, তাঁরাই সাক্ষী: আমি মুসলিমকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য তাদের জড়ত্ব, আলস্য, কর্মবিমুখতা, ক্লৈব্য, অবিশ্বাস দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছি। বাংলার মুসলমানকে শির উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য—যে শির এক আল্লাহ ছাড়া কোনো সম্রাটের কাছেও নত হয়নি—আল্লাহ যতটুকু শক্তি দিয়েছেন তাই দিয়ে বলেছি লিখেছি ও নিজের জীবন দিয়েও তার সাধনা করেছি। আমার কাব্যশক্তিকে তথাকথিত 'খাটো'

করেও গ্রামোফোন রেকর্ডে শত শত ইসলামি গান রেকর্ড করে নিরক্ষর তিন কোটি মুসলমানের ইমান অটুট রাখারই চেষ্টা করেছি। আমি এর প্রতিদানে সমাজের কাছে জাতির কাছে কিছু চাইনি। এ আমার আল্লার হুকুম, আমি তাঁর হুকুম পালন করেছি মাত্র। আজো আমি একমাত্র তাঁরই হুকুমবরদাররূপে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেছি—আমার দীর্ঘদিনের গোপন তীর্থযাত্রার পর।

আমি আজ জিজ্ঞাসা করি : আমি লীগের মেম্বার নই বলে কি কোনো লীগ-কর্মী বা নেতার চেয়ে কম কাজ করেছি? আজো 'নবযুগে' এসেছি শুধু মুসলমানকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে—তাদের প্রবল করে তুলতে—তাদের আবার 'মার্টায়ার'—শহীদি সেনা করতে। বাংলার মুসলমান বাংলার অর্ধেক অঙ্গ। কিন্তু এই অঙ্গ আলস্যে জড়তায় পঙ্গু। এই অঙ্গকে প্রবল না করলে বাংলা কখনো পূর্ণাঙ্গ হবে না। বাংলার এই ছত্রভঙ্গ ছিন্নদল মুসলমানদের আবার এক আকাশের ছত্রতলে, এক ঈদগাহের ময়দানে সমবেত করার জন্যই আমি চিরদিন আজান দিয়ে এসেছি। 'নবযুগে' এসেও সেই কথা বলেছি ও লিখেছি ; এই 'নবযুগে' আসার আগে বাংলার মুসলমান নেতায় নেতায় যে ন্যাতা টানাটানির ব্যাপার চলেছিল—সেই গ্লানিকর বিদ্বেষ ও কলহকে দূর করতেই আমি লেখনি ও তলোয়ার নিয়ে, আমার অনুগত নির্ভীক, দুর্জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী 'নৌ-জোয়ানদের' নিয়ে—ভাইয়ে ভাইয়ে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে এসেছি। আমি কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করতে আসিনি। আল্লাহ জানেন, আর জানেন—যাঁরা আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত তাঁরা—আমি কোনো প্রলোভন নিয়ে এই কলহের কুরুক্ষেত্রে যোগদান করিনি। 'লীগ' কেন, 'কংগ্রেস'কেও আমি কোনোদিন স্বীকার করিনি। আমার 'ধূমকেতু' পত্রিকা তার প্রমাণ। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কোনোদিন লিখিনি—কিন্তু তার নেতাদের বিরুদ্ধে লিখেছি। যে কোনো আন্দোলনেরই হোক, নেতারা যদি নির্লোভ, নিরহংকার ও নির্ভয় না হন, সে আন্দোলনকে একদিন না একদিন ব্যর্থ হতেই হবে।

লীগের আন্দোলন যেমন 'গদাই লস্করি' চালে চলছিল তাতে আমি আমার অন্তরে কোনো বিপুল সম্ভাবনার আশার আলোক দেখতে পাইনি।...

আমি 'লীগ' 'কংগ্রেস' কিছুই মানি না, মানি শুধু সত্যকে, মানি সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে, মানি সর্বজনগণের মুক্তিকে। এক দেশের সৈন্যদল অন্যদেশ জয় করতে যায় বরং তাদেরও স্বীকার করি—কিন্তু স্বীকার করি না ভীরুর আস্ফালনকে, জেল কয়েদিদের মারামারিকে। এক খুঁটিতে বাঁধা রামছাগল, এক খুঁটিতে বাঁধা খোদার খাসি, কারুর গলার বাঁধন টুটল না, কেউ খুঁটি মুক্ত হলো না, অথচ তারা তাল ঠুকে এ ওকে ঘুস মারে! দেখে হাসি পায়।

মুসলমানের জন্য আমার দান কোনো নেতার চেয়ে কম নয় ; যে-সব মুসলমান যুবক আজ নবজীবনের সাড়া পেয়ে দেশের জাতির কল্যাণের সাহায্য করছে তাদের প্রায় সকলেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে এই ভিক্ষুকের ভিক্ষা-ঝুলি থেকে।

আল্লার সৃষ্টি এই পৃথিবী আজ অসুন্দরে, নির্যাতনে, বিদ্বেষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানুষ আল্লার খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি—'ভাইসরয়।' মানুষ আল্লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ

চেষ্টা করলে সমস্ত ফেরেশতাকেও বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে, ত্রি-লোকের বাদশাহি পেতে পারে—এ আল্লাহর নির্দেশ। মানুষ মাত্রেই আল্লার সৈনিক। অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে সর্ব নির্যাতন, সর্ব অশান্তি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে মানুষের জন্ম। আমি সেই কথাই আজীবন বলে যাব, লিখে যাব, গেয়ে যাব ; এই জগতের মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশকে আবার পূর্ণ শুদ্ধ পূর্ণ নির্মল করব—এই আমার সাধনা। পূর্ণ চৈতন্যময় হবে আল্লার সৃষ্টি এই আমার সাধ। পূর্ণ আনন্দময়, পূর্ণ শান্তিময় হবে এ পৃথিবী—এ আমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাস আল্লাতে বিশ্বাসের মতোই অটল। 'ফিরদৌসআলা'—পূর্ণ আনন্দধাম থেকে আমরা এসেছি। পৃথিবীতে সেই আনন্দধামেরই প্রতিষ্ঠা করব—এই আমাদের তপস্যা। এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর একমাত্র আল্লাহ। যারা এই পৃথিবীতে নিজেদের রাজত্বের দাবি করে তারা শয়তান। সে শয়তানদের সংহার করে আমরা আল্লার রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করব। যে মুসলমানের ক্ষাত্রশক্তি নাই, সে মুসলমান নয়। যে ভীরু সে মুসলমান নয়। এই ভীরুতা, এই তামসিকতা, এই অপৌরুষকে দূর করাই আমার লীগ, আমার কংগ্রেস। এ-ছাড়া আমার অন্য লীগ-কংগ্রেস নাই।

দৈনিক 'নবযুগ'
১৯৪১

নবযুগের সাধনা

[১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে নবপর্যায়ে প্রকাশিত 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্তিক মঙ্গলবারের 'নবযুগ'-এ 'নবযুগের সাধনা' শিরোনামে নজরুলের স্বাক্ষরিত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ২৫.৮.১৯৪৫ তারিখের কলকাতা গেজেটের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তৎকালীন অখণ্ড বাংলার জনশিক্ষা বিভাগের মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক মৎপ্রণীত 'মঞ্জুমালা' সমগ্র বঙ্গদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সপ্তম শ্রেণির বাংলা পাঠ্য-পুস্তকরূপে অনুমোদিত হয়। উক্ত পুস্তকের প্রথম লেখা হিসেবে ছাপা হয় নজরুলের 'যুগের সাধনা'—'নবযুগের সাধনা' নিবন্ধেরই 'ঈষৎ-পরিবর্তিত' পাঠ। নজরুলের 'নবযুগের সাধনা' ছিল কথ্য ভাষায় লেখা এবং দীর্ঘ ; সেটিকে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা-অনুসারে সাধু ভাষায় ঈষৎ পরিবর্তিত ও সংক্ষেপিত করা হয়। মূল 'নবযুগের সাধনা' সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না বলে অগত্যা 'যুগের সাধনা' এখনে সংকলিত হলো—সম্পাদক]

যুগে যুগে আদর্শবাদীরাই জগতকে আনন্দে, শান্তিতে ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাঁহারা বৃহতের চিন্তা করেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করেন। ক্ষুদ্রত্বের বন্ধনে বাঁধা থাকিলে জীবন, যৌবন ও কর্মের শক্তি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। পুকুরের জল গ্রামের কল্যাণ করে, কিন্তু সংক্রামক রোগের একটি জীবাণু পড়িলেই সে জল দূষিত ও

অপেয় হইয়া যায়। কেননা, পুকুরের জলের চারিধারে বন্ধন ; তার বিস্তৃতি নাই, গতি নাই, প্রবাহ নাই। নদীর জলেরও চারিধারে বন্ধন,—এক ধারে পাহাড়, এক ধারে সমুদ্র, দুই ধারে কূল। কিন্তু তার বিস্তৃতি আছে, তাই গতি ও প্রবাহ নিত্যসাথী। এই প্রবাহের জন্যই নদীর জলে নিত্য শত রোগের বীজাণু পড়িলেও তাহা অশুদ্ধ হয় না, অব্যবহার্য হয় না। তাই নদী পুকুরের চেয়ে দেশের বৃহৎ কল্যাণ করে। নদীর নিত্য তৃষ্ণা সমুদ্রের দিকে, অসীমের দিকে। অসীম সমুদ্রকে পাইয়াও সীমাবদ্ধ দেশকে সে স্বীকার করে,—তার বক্ষচ্যুত হয় না। আমাদের আদর্শ পরম পূর্ণের ; পরম নিত্যের তৃষ্ণা হইলেও আমরা কর্মচ্যুত হইব না, বৃহৎ কর্ম করিব।

বৃহৎ কর্মের অধিকারী হইতে হইলে, দেশের মানুষের বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করিতে হইলে, বৃহৎ শক্তির আধার হইতে হয়। নিত্য পরম ক্ষমাময় আল্লাহর তৃষ্ণা থাকিলে এই বৃহৎ কর্মের অধিকারী হওয়া যায়। নদী সমুদ্রের তৃষ্ণা নিয়ে ছোটে, তাই সমুদ্রকে পায়। সমুদ্রের তৃষ্ণা ছাড়া নদীর অন্য তৃষ্ণা নাই, তবু যাইতে যাইতে তার দুই কূলকে শস্য-শ্যামল, ফুলে ফলে ফুল্ল করিয়া যায় ; দুই কূলের লোকের সমস্ত অশুদ্ধিকে নিজের দেহে নেয় ; তার দুই কূলের আবহাওয়াকে শুদ্ধ রাখে।

আত্মত্যাগী সাধকেরাই আনিবেন বদ্ধ জীবনে প্রাণশক্তির দুর্জয় প্রবাহ। যাঁহারা নবযুগের ছেলেমেয়ে, তাঁহারা এই প্রবাহে মুক্ত হইয়া এই প্রবাহ-তরঙ্গকে গগনস্পর্শী করিয়া তুলুন—ইহাই নিপীড়িত মানবাত্মার প্রার্থনা।

শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের গঠন-প্রণালী

[শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র-রূপে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর মুতাবিক ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষ 'লাঙল' আত্মপ্রকাশ করে। নজরুল ইসলাম ছিলেন পত্রিকার প্রধান পরিচালক এবং দলের সাধারণ সম্পাদক।]

১। নাম : ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায় এই দলের নাম হইবে।

২। উদ্দেশ্য : নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য।

৩। উপায় : নিরস্ত্র গণ-আন্দোলনের সমবেত শক্তি-প্রয়োগ উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের মুখ্য উপায় হইবে।

৪। সভ্যপদ : ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির যে-কোনো সভ্য এই দলের উদ্দেশ্য, গঠন-প্রণালি এবং কার্যপদ্ধতি অনুমোদন করেন তিনিই কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির মতো হইলে শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের সভ্য হইতে পারিবেন।

শ্রমিক এবং চাষির স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারণের কথা যতদিন স্বরাজ্যদলের সভ্য হওয়ায় বাধা নাই।

৫। চাঁদা : এই দলের প্রত্যেক সভ্য বার্ষিক এক টাকা চাঁদা দিবেন। শ্রমিক ও কৃষক হইলে বার্ষিক এক আনা চাঁদা লাগিবে। প্রয়োজনস্থলে প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সমিতি চাঁদা না লইতেও পারেন।

৬। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েৎ : কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েৎ কমবেশি পনেরজন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে। দলের সৃষ্টিকর্তাগণ তাঁহাদের প্রথম সভায় তিন বৎসরের জন্য ইহাদিগকে নির্বাচিত করিবেন। পঞ্চায়েতগণ নিম্নলিখিত বিভাগগুলির এক বা ততোধিক বিভাগের ভার লইবেন এবং তদ্বিষয়ে চরম ক্ষমতা পাইবেন।

১ম প্রচার ; ২য় অর্থ ; ৩য় দল গঠন ; ৪র্থ শ্রমিক ; ৫ম চাষি ; ৬ষ্ঠ ব্যবস্থাপক সভা। পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সভ্যের এক ভোট থাকিবে। সমান সমান স্থলে যে ব্যক্তি সভাপতির কাজ করিবেন, তিনি কাস্টিং ভোট দিতে পারিবেন। তিনজন সভ্য থাকিলেই পঞ্চায়েতের কার্য চলিতে পারিবে।

৭। প্রাদেশিক পঞ্চায়েৎ : কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতের দ্বারা নিযুক্ত পাঁচ হইতে নয়জন সভ্য লইয়া ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি নির্দিষ্ট প্রত্যেক প্রদেশের প্রাদেশিক পঞ্চায়েৎ গঠিত হইবে।

৮। প্রাদেশিক পরিষদ : প্রাদেশিক পঞ্চায়েতের দ্বারা প্রথম অবস্থায় এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত প্রত্যেক জেলার জন্য এক বা একাধিক প্রতিনিধি লইয়া প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হইবে।

৯। জেলার জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধিগণ জেলা, মহকুমা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্য পরিষৎ গঠনের চেষ্টা করিবেন। এই সকল পরিষদ গঠিত হইলে প্রাদেশিক পরিষদ, প্রাদেশিক পঞ্চায়েৎ এবং কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতের সভ্য নির্বাচনপ্রণালি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১০। উপরি-উক্ত নিয়মাবলীর বহির্ভূত কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েৎ করিবেন। এবং সে বিষয়ে তাঁহাদের মতই চরম বলবান হইবে।

কর্মনীতি ও সংকেত

যেহেতু বিদেশি আমলাতন্ত্রের সৃষ্ট এবং সেই আমলাতন্ত্রের শাসন-প্রণালির স্থিতির উপর যাহাদের চরম অস্তিত্বনির্ভর করে, সমাজের সেই শ্রেণির স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত ও কাউন্সিল বর্জনের দাবি করিয়া অসহযোগ আন্দোলনের অসফলতার অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানে বোঝা যাইতেছে।

যেহেতু ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের বাধা-প্রদাননীতি চেষ্টা দ্বারা আমলাতন্ত্রকে ভারতের জাতীয় দাবির পরিপূরণে উদ্বুদ্ধ করা যায়

নাই, এবং সমস্ত ব্যবস্থা পরিষদগুলি স্বরাজ্যদলের সভ্যগণের দ্বারা অধিকৃত হইলেই ভবিষ্যতে ঐ নীতির সফলতার আশা দেখা যাইতেছে না।

যেহেতু ভারতের স্বাধীনতা-সমরের সেনানিগণের যথেচ্ছ গ্রেপ্তার এবং বিনা বিচারে আবদ্ধ হওয়া বিষয়ে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলের একযোগে তীব্র প্রতিবাদ আমলাতন্ত্রের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হয় নাই।

যেহেতু অসহযোগ আন্দোলনের একমাত্র ধারা যাহাতে সাক্ষাৎ প্রতিরোধ ক্রিয়ার সার্বজনীন প্রয়োগ দেশব্যাপী ধর্মঘট ও খাজনা বন্ধের দ্বারা হইতে পারিত এবং তদ্বারা শাসনযন্ত্র ও শোষণযন্ত্র হইতে হাত সরাইয়া লওয়া হইত, সেই ধারার প্রয়োগ বিষয়ে ভারতের সমস্ত অগ্রগামী রাজনৈতিক দলই বিরোধী বা নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন।

যেহেতু দেখা গিয়াছে যে গলাবাজি অথবা ত্রাসনীতিতে অনিচ্ছা আমলাতন্ত্রের হাত হইতে স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা অতীতে কেবলই বিফল হইয়াছে ; আমলাতন্ত্রের নিকট খোশামুদি দ্বারা ভারতবর্ষের লোকের অবস্থার প্রকৃত উন্নয়ন আনয়ন সম্ভব নয়, কিংবা সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ স্বদেশীয়গণের সাহায্যেই নিরস্ত্রীকৃত জনসাধারণের স্বাধীনতা গুপ্তহত্যার সাহায্য আসিতে পারে না ; বোমা এবং পিস্তলের শক্তি অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী গণআন্দোলনের চলমান শক্তির প্রয়োগ দ্বারাই নিরস্ত্র জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া বোধ হইতেছে।

যেহেতু ভারতীয় স্বরাজের যে কর্মসংকল্পের ভিতর ভূমিস্বত্বের বিষয়ে কথা নাই এবং যেহেতু কোনো কৃষিজীবী জাতির সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম এবং শ্রেষ্ঠ অধিকার সেই—যাহাতে সে নিজের জমির নিজে স্বত্বাধিকারী হয় ; এবং ভূমির স্বত্বে স্বাধীনতা না থাকিলে অন্য সমস্ত অধিকার ভোগে সুখ হয় না ; এবং উপরিস্থ ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী ভূমিস্বত্ব ক্রীতদাসত্বের আইনসঙ্গত নামান্তর মাত্র। যেহেতু প্রতিযোগিতা আধুনিক সভ্যতার কলঙ্ক, এবং ভারতীয় প্রকৃত সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার স্থলে যতদিন না সহযোগিতা ও পরস্পর সেবার ইচ্ছা প্রবর্তিত না হয়।

যেহেতু শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যেমন বলিয়াছেন যে, শ্রেণিগত স্বার্থত্যাগী শুদ্ধ যুবক, শ্রমিকও কৃষকের সংযোগ না হইলে ভারতের মুক্তি আসিবে না।

অতএব ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায় এই ঘোষণা করিতেছেন যে, ভারতের জাতীয় দাবি পূরনের এখনো একমাত্র অবশিষ্ট উপায় এই যে, দেশের শতকরা আশিজন যাহারা—সেই শ্রমিক ও কৃষকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং তাহাদিগকে জন্মগত অধিকার লাভের সাহায্য করা, যাহাতে তারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে আরো সচেতন হইয়া নিজেদের ক্ষমতায় এবং নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাশালী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের হাত হইতে স্বাধীনতা আনিতে পারে। এবং এতদর্থে উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায় নিম্নলিখিত কর্ম-সংকল্পের অবতারণা করিতেছেন :

১। এই দল শ্রমিক ও কৃষকগণের স্বার্থের জন্য যুঝিবেন। (ভদ্র এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে কোনো ব্যক্তি নিজের হাত পা বা মাথা খাটাইয়া নিজের জীবিকা অর্জন করে, তাহাকে শ্রমিক বলিয়া গণ্য করা হইবে)।

২। জাতীয় কার্যে নিযুক্ত অন্যান্য দলের সহিত এই দল যতটা সম্ভব সহযোগিতা করিবেন।

৩। শ্রমিক ও কৃষকগণের নিম্নলিখিত দাবিগুলির জন্য অন্যান্য দাবি ছাড়াও যাহারা যুঝিবেন, ব্যবস্থাপক সভার এমন সমস্ত প্রতিনিধির নির্বাচনে এই দল সাহায্য করিবেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহারা এই দলের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন।

ক। ব্যবস্থা পরিষদে এই দলের প্রতিনিধিগণ নিজেদের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

খ। সম্ভব হইলে প্রতিনিধিগণ চেষ্টা করিবেন :

১. যতদিন না শ্রমিক ও কৃষকগণের অধিকারসমূহ স্বীকার করিয়া শাসন-প্রণালি পরিবর্তিত না হয়, ততদিন টাকা মঞ্জুরি বাজেটে না দেওয়া।

২. আমলাতন্ত্র শাসন-প্রণালির শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করে এমন সমস্ত প্রস্তাবের বিরোধী হওয়া।

৩. জাতীয় জীবনের শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল এবং সে কারণে আমলাতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধির প্রতিকূল এমন সমস্ত প্রস্তাব আইনের প্রবর্তন করা ও সমর্থন করা।

গ। ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত সম্মতি বিনা গভর্নমেন্টের অধীনে কোনো প্রতিনিধি কোনো চাকরি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

চরম দাবি

১। আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টিমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকারী জিনিস লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মিগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তি-রূপে পরিচালিত হইবে।

২। ভূমির চরম স্বত্ব আত্মঅভাব-পূরণ-ক্ষম স্বায়ত্তশাসন-বিশিষ্ট পল্লিতন্ত্রের উপর বর্তিবে—এই পল্লি-তন্ত্র ভদ্র শূদ্র সকল শ্রেণির শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।

১. শ্রমিক :

ক। জীবনযাত্রার পক্ষে যথোপযুক্ত মজুরির একটা নিম্নতম হার আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া।

খ। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের পক্ষে সপ্তাহে পাঁচদিন খাটুনি চরম বলিয়া আইন করা ; নারী এবং অল্পবয়স্ক ছেলেপিলের জন্য বিশেষ শর্ত নির্ধারিত করা।

গ। শ্রমিকগণের আবাস, কাজের শর্ত, চিকিৎসার বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি দাবি মালিকগণকে আইন দ্বারা বাধ্য করিয়া পূরণ করানো।

ঘ। অসুখ, বিসুখ, দুর্ঘটনা, বেকার অবস্থা এবং বৃদ্ধ অবস্থায় শ্রমিকগণকে রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রণয়ন।

ঙ। সমস্ত বড় কলকারখানায় লাভের ভাগে শ্রমিকগণকে অধিকারী করা।

চ। মালিকগণের খরচায় শ্রমজীবীগণের বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

ছ। কলকারখানার নিকট হইতে বেশ্যালয়, নেশার দোকান উঠাইয়া দেওয়া।

জ। শ্রমিকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

ঝ। শ্রমিক-সঙ্ঘগুলিকে আইনত মানিয়া লওয়া এবং শ্রমিকদের দাবি পূরণের জন্য ধর্মঘট করিবার অধিকার স্বীকার করা।

১. কৃষক :

ক। ভূমিকর সম্বন্ধে একটা উর্ধ্বতম হার বাঁধিয়া দেওয়া এবং বাকি খাজনার সুদ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সুদের হারের সহিত সমান নির্ধারণ করা।

খ। (১) জমিতে কায়েমি স্বত্ব ; (২) উচ্ছেদ নিরোধ ; (৩) অন্যায় এবং বে-আইনি বাজে আদায় বন্ধ ; (৪) স্বেচ্ছায় বিনা সেলামিতে হস্তান্তর করার অধিকার ; (৫) গাছ কাটা, কুয়ো খোঁড়া, পুকুর কাটা, পাকা বাড়ি করার বিনা সেলামিতে অধিকার।

গ। জল-করে মাছ ধরিবার নির্ধারিত শর্ত।

ঘ। মহাজনের সুদের চরম হার নির্ধারণ।

ঙ। কো-অপারেটিভ কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা কৃষককে ঋণদান এবং মহাজন ও লোভী ব্যবসাদারগণের হাত হইতে কৃষককে উদ্ধার।

চ। চাষের জন্য যন্ত্রপাতি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মারফত কৃষকের নিকট বিক্রয় অথবা ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেওয়া। মূল্য অথবা ভাড়ার টাকা কিস্তিবন্দি হিসাবে অল্প অল্প করিয়া লওয়ার বন্দোবস্ত।

ছ। পাটের চাষে কৃষকের উপযুক্ত লাভের বন্দোবস্ত।

এই দলে যোগ দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দিবেন :
নজরুল ইসলাম, ৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লাঙল
১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
১৬ই, ডিসেম্বর ১৯২৫

একটি রূপক রচনার খসড়া পরিকল্পনা

[নজরুল ইসলামের এই অসমাপ্ত রচনাটির পাণ্ডুলিপি সুরশিল্পী শ্রীজগৎ ঘটকের সংগ্রহে আছে। এতে একটি রূপক নাটকের খসড়া বিষয়-কল্পনা draft theme আছে বলে অনুমিত হয়।]

জনক = যে শস্য ফসল উৎপাদন করে।
রাম = কৃষকদের প্রতিনিধি (জনগণ-অধিনায়ক)।
সীতা = জনক অর্থাৎ শস্য-উৎপাদকের কন্যা : শস্য।
হরধনু-ভঙ্গ = অর্থাৎ Hard Soil উর্বর করে শস্য অর্থাৎ সীতাকে পাওয়া।
লক্ষ্মণ = শ্রীমান (?)।
রাবণ = যে সেই শস্য বা সীতাকে হরণ করে। লোভের প্রতীক। যে বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করে, দশ মুখ দিয়ে গ্রাস করে।
রাম = জনগণ বা কৃষকদের প্রতিনিধি, তাই দুর্বাদল-শ্যাম।
হনুমান = নৌ-যান ও আকাশ-যানের প্রতীক।
পবন = গতি (speed)
ভরত = President
শত্রুঘ্ন = শত্রুহন্তা।
কুশ-লভ = শস্যের দুই অর্ধ।
বিভীষণ = লোভের সহোদর নির্লোভ : বিবেক।
কৌশল্যা = ডিপ্লোমেসি ; তার গর্ভেই জনগণ-অধিনায়ক জন্ম নেয়।
দশরথ = দশ দিকে যার অব্যাহত গতি।
রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই কুবের। ঐশ্বর্যের দুই দিক—দৈবশক্তিতে ঐশ্বর্য নিয়োজিত হলে মঙ্গল সাধন করে ; রাক্ষস শক্তিজাত ঐশ্বর্য অমঙ্গল সাধন করে, লুণ্ঠন করে।
কুশ = যজ্ঞাদি কার্যে লাগে ; তৃণ।
লব = কুশের নিম্নার্ধ ভাগ।
সীতার পাতাল প্রবেশ = রাম অর্থাৎ কৃষকদের প্রতিনিধি যখন শস্যকে অবহেলা করে জনগণের দুর্বুদ্ধিপ্রসূত স্বর্ণকে গ্রহণ করেন, তখন শস্য পাতাল প্রবেশ করেন। অর্থাৎ শস্য-উৎপাদিকা-শক্তিকে অবহেলা করে স্বর্ণরৌপ্যকে (স্বর্ণসীতাকে), বড় করে ধরলে দেশের সমূহ অকল্যাণ হয়। এই ভ্রম বুঝে রামকে বা জনগণের প্রতিনিধিকে সরযুর জলে ডুবতে হয়।
কৈকেয়ী ও মন্থরা = দুর্বুদ্ধি।
কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি বনবাসে গেলে বা Departure হলে শস্য অর্থাৎ সীতাও সহগামিনী হন। কৃষক ও শ্রমিক সাহায্য না পাওয়ায় রাবণ শস্যহরণ করতে সমর্থ হয়।
রাবণ = ঐশ্বর্য-পিপাসী সুমালির দৌহিত্র। কুবেরের ঐশ্বর্য দেখে সুমালির ঈর্ষা হয়,—সেই ঈর্ষা বুদ্ধিপ্রসূত যে issue. তারই নাম নিকতা। তার সন্তান লোভ বা রাবণ।

বিশ্রুবা = ঋষি।
রাবণ = ব্রাহ্মণ-শক্তি + রাক্ষস-শক্তি।

চানাচুর

[১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের দিকে জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সম্পাদনায় ১১ নং ওয়েলসলি স্ট্রিট, কলিকাতা থেকে 'সাপ্তাহিক সওগাত' প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'সওগাত' পত্রিকার বিশেষ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ সংখ্যায় তাঁরই লেখা 'সওগাত ও নজরুল ইসলাম' শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে 'সাপ্তাহিক সওগাত' সম্বন্ধে জনাব আবুল মনসুর আহমদের মন্তব্যের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে :-

> -'...সাপ্তাহিক সওগাত' মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর সুচিন্তিত লেখায় এবং নজরুল ইসলামের রসরচনায় অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সাহিত্য-সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ... এতে নজরুল ইসলাম 'চানাচুর' শিরোনামায় যে একটি ফিচার লিখিতেন, সেটি পড়িবার জন্য পাঠক-মহলে কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইত। ...'

জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁর প্রবন্ধে 'চানাচুর' শিরোনামায় নজরুল ইসলামের কয়েকটি রসাত্মক লেখা উদ্ধৃতি করে দিয়েছেন ; তা থেকে এখানে ৮টি লেখা সংকলিত হলো। —সম্পাদক]

১
ডোমনি স্টেটাস

ভারতমাতা এতদিন পদদলিতা দাসী ছিলেন। শুনছি তাঁর পুত্রদের সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে তার প্রভু নাকি তাঁর হাত-পায়ের কতক বাঁধন খুলে দিয়ে 'ডোমনি স্টেটাস'-এর (Dominion status) তকমা পরিয়ে দেবেন।

ভারতমাতার বল-দ (বলদানকারী) পুত্রদের মধ্যে এই নিয়ে এরই মধ্যে মোচ্ছবের ধূম লেগে গেছে। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠছে 'মা ডোমনি হবেন রে, মা ডোমনি হবেন।'

মা-এর অবস্থা মা-ই জানেন। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে তিনি বোধ হয় মনে মনে বলছেন 'এদের আঁতুর ঘরেই নুন খাইয়ে মারিনি কেন?'

ডোমনির ছেলেই বুঝি বা ! হাতে যা বড় বড় ধামা !

২
পুনর্মূষিকো ভব !

কাবুলের 'আঙুল-ফুলে কলাগাছ' বাচ্চা-ই-শাকা এখন নাদির খাঁর তরবারি তলে 'নফসি নফসি' করছে।

যে ভিস্তিকে সেই ভিস্তি। কোনো 'রেকর্ড কিপার' ফেরেশতার ভুলে হয়তো ভিস্তি বেহেশতি হয়ে গিয়েছিল। তাই কাবুলের ভাগ্যে এত বিড়ম্বনা। যাক, ফেরেশতার ভুল ফেরেশতাই শুধরে নিয়েছেন। বাচ্চু মিঞাকে হয়তো আবার কাবুলের রাস্তায় মশক ঘাড়ে করে পানি দিতে হবে কিংবা কাবুলের শুকনো রাস্তা তার রক্তে ভিজাতে হবে।

ও নিয়ে যাদের মাথা ব্যথা বেশি, তারাই ওর হেস্তনেস্ত করবে। কিন্তু যাদের এতদিন 'মাথা নাই তার মাথা ব্যথা' হচ্ছিল বাচ্চাকে নিয়ে, তাদের উপায় হবে কি?

বেচারাদের 'গাজি' যে গাঁজিয়ে উঠল। ইসলাম রক্ষার উপযুক্ত 'গাজি' পেয়েছিল বটে। বেড়ালকে দিয়েছিল মাছ বাছবার ভার।

আরশুলো হলো পাখি!

বেওকুফ আর কাকে বলে?

আশা করি বাচ্চা মরবার সময় তার মশকটা এইসব ভক্ত মিঞা সায়েবদের পাঠিয়ে দেবে। ওরা ঐ মশকের এক চল্লু করে পানি খাবেন আর শোকর গোজারি করবেন। অথবা ওটাকে ওদের 'বিস্তারা' বাঁধবার 'হোল্ডল' (Hold-all) করেও ব্যবহার করতে পারেন। যা অভিরুচি!

৩

চতুর্বর্গ-ফলের বোঁটা

সেদিন কলকাতার টাউন হলে বড় এক মজার অভিনয় হয়ে গেছে। যত সব বুড়ো ও পণ্ডিতের দল তাদর অচৈতন্য চৈতন-চুটকিতে কাঁঠালের আঠা ও ছাই মাখিয়ে দিব্যি তাতিয়ে খাড়া করে সর্দার বিলের প্রতিবাদ কল্পে জমা হয়েছিল। এ ধারে কিন্তু খবর পেয়ে যত সব টিকি-নিসূদন কালাপাহাড়ি তরুণের দল ক্ষুর কাঁচি নিয়ে তৈরি হয়েছিল। যাহা বুড়োর দলের 'যুদ্ধং দেহি' বলে আর্কফলা উঁচিয়ে তেরে আসা তাহা 'এই লেহি' বলে তরুণ দলের ঝাঁপিয়ে পড়া।

সে এক ধূম ধাত্তর ব্যাপার! ছোঁড় চেয়ার, ভাঙ টেবিল, চালাও লাঠি, ছেঁড় টিকি! মার জোয়ান! হেইয়ো! পটাস? উ-হু-হু!!

বাস! পলকে পেল্লায়! বুড়োর দল, পণ্ডিতের দল বিষ্টিতে ছাগলের মতো যে যে দিকে পারলে দিলে চোঁ চোঁ দৌড়।

ছেলেদের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাদের প্রায় প্রত্যেকের হাতেই সদ্য উৎপাটিত গুচ্ছ গুচ্ছ টিকি! মনে হলো শত শত কালি সিংহ। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এই টিকি ছেঁড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন শত শত মহিলা, যাদের উদ্ধারকল্পে এইসব টিকির দল জমায়েত হয়েছিলেন।

বুড়োরা সত্যই কি এবার নি-কশ হল? নৈষ্ঠিক নি-টিক হল?

৪

বিবাহ-আইন বিল

লাগ লাগ লাগেয় মাটি
যে হারে তার কান কাটি !

বড় মিঞাদের রাজ পরিষদে অর্থাৎ 'অ্যাসেমব্লিতে' বিবাহ আইন বিল পাস হতে দেখে বুড়োদের দল মুক্ত-কচ্ছ হয়ে চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছেন—গেল রাজ্য, গেল মান, ধর্ম কর্ম সব গেল।

বটেই তো। বেচারাদের তৃতীয় পক্ষ চতুর্থ পক্ষের যে দফা নিকেশ হলো তাহলে ! মেয়েগুলো বিয়ে হবার আগে ডাগর-ডুগর হয়ে গেলে যেসব বুঝে ফেলবে। তখন কি আর ফোকলাদন্তী চুপসায়িত কপোল অষ্টাবক্রীয়-কটী বুড়োদের ওরা বিয়ে করতে চাইবে ? ইয়া আল্লা ! ই কি গজব !

চারিদিকে দিয়ে বুড়ো আর তরুণ মনের টুসাটুসি লেগে গেছে। দেখা যাক, কে হারে কে জেতে।

এর পরেও যদি বুড়োরা না মরে, তাহলে আমরা বলি, 'কর্তা ! আমরা তোমার গলায় দিয়া দিমু ফাঁসি !'

৫

চারদিক থেকে পাগলা তোরে ঘিইরা ধরেছে পাপে !

ফ্যাসাদ কি শুধু সাহিত্যে, কৌন্সিলে, অ্যাসেমব্লিতেই বেধেছে ?—জোয়ান বুড়োর এ লড়াই পলিটিকসে কংগ্রেস পর্যন্ত গড়িয়েছে !

সেখানেও মহাত্মা গান্ধি কংগ্রেসের সভাপতি হতে নারাজ হয়ে তরুণ দলের প্রতিনিধি জহরলাল নেহরুকে সুপারিশ করেছেন ঐ গদির গদ্দিনশিন করবার জন্য।

হায় ব্রুতাস, তুমিও ! বুড়োদের বদন ক্রমেই ব্যাদিত হয়ে চলেছে !

বুড়োরা তো অনেকেই আফিম খান, আমরা বলি কি, ওর মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিল না ওঁরা। সব ল্যাঠা একদিনেই চুকে যাক !

ঠুঁটো জগন্নাথের দল ! গাল দিই কি সাধে ! যেমন উনুন-মুখো দেবতা, তেমনি ছাই পাঁশ নৈবিদ্য।

৬

'হায় জানতি পার না।'

সেদিন তুমুল তর্ক দুই নেতায় ! যাকে বলে মেড় টুঁস। একজন বলছিলেন, 'আরে ইতা কিতা কন ! স্বরাজ আমাদের তো ওইয়াই গেছে ! সেতুবন্ধ বাইন্দ্যা ফেলছি। অ্যাহন

ফাল দিয়া উৎকা মাইর‍্যা হ্যালার লক্ষ্যয় গিয়া পড়লেই অয়! সোলেমান বাদশার লাহান উ হালায় ও মইর‍্যা বুত ওইয়া গ্যাছে। হ্যালা-মারছেন কি—উপ্‌পুত ওইয়্যা যাইবো!'

আর একজন বলছিলেন, 'দেখুন আপনার কথা শুনে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। একজন মিস্তিরি অস্ত্র তৈরি করত। সে একদিন দেশের রাজার কাছে এসে হাম্বাই তাম্বাই করতে লাগল,—হুজুর, আমার মতন তলওয়ার তৈরি করতে পৃথিবীতে কেউ পারে না। রাজা বললেন, 'কি করে বুঝব?' মিস্তিরি বললে, 'আমি আমার তলোয়ার দিয়ে এমন সাফ সাফ গলা কেটে দিব যে, সে জানতেই পারবে না, এমন ধার।'

রাজার খেয়াল, লোক ধরে আনা হল। মিস্তিরি আস্তে গলার ওপর দিয়ে তার তলোয়ার চালিয়ে দিলে! লোকটা কিন্তু তখনো দিব্যি দাঁড়িয়ে হাসছে, যেন কিছুই হয়নি। রাজা বললেন, ওর যে গলা কাটা গেছে কি করে বুঝব? মিস্তিরি অমনি তার নস্যির কৌটা থেকে এক চিমটি নস্যি নিয়ে যেমনি লোকটার নাকে দেওয়া, অমনি হ্যাঁচচো, সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মাথা টুপ করে পড়ে গেল, 'কি মশাই বিশ্বাস হচ্ছে না?'

আগের লোকটি বলতে বলতে উঠে গেলেন, 'আপনোগর প্যাটে মায়ের ডাকই হান্দায়নি, বুঝবোন কিদুন কইর‍্যা?'

৭

ফল ইন (লভ নয়) ওয়ার!

নিরস্ত্র ভারতে নখদন্তহীন ভেতো বাঙালির নিরামিষ 'সেনা-বাহিনী'র পতি ওরফে 'জেনারেল অফিসার কমান্ডিং 'মারশিয়াল' সুভাষচন্দ্র বসু 'রেজিমেন্টাল' অর্ডার বের করেছেন—তার 'ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাওয়া' রিজার্ভ ফোর্সের সেনাদের 'ফল-ইন' করতে। 'বোনাফাইড' বাঙালি ছেলেদের 'ফল-ইন-লভ'-টাই রপ্ত হয়ে গেছে, লড়ালড়ির 'ফল-ইন'টা তাদের হয়ে শতাব্দী পূর্বে পিতৃপুরুষেরাই করে গেছেন। কাজেই 'মারশিয়াল' (সেনাপতির) হুকুম তারা যে মানবে তা তো মনে হয় না। বাঙালি মেয়েরা দিব্যি পতিপ্রাণা কিন্তু ছেলেরা রীতিমতো অসতী! তাদের দলের পতিকে বড় একটা কেয়ার করে না! তবে যারা আসবে, তারা এই ভরসাতেই আসবে যে, আপাতত যুদ্ধের মতো বদখত কোনো জিনিস তাদের মহাবেরা করতে হবে না! এ সেনাদল শুধু নিরস্ত্র নয়, নি-লাঠি! আর মাঠে কুচকাওয়াজ যা হবে তা শুধু পায়েরই কসরৎ। কাওয়াজে'র কাজ নাই, শুধু কুচের কাজ। তা বাঙালির বিপদে আপদে ছুট দেওয়া যাঁরা দেখেছেন, তারাই বলবেন যে, ও জিনিসটে বাঙালি মায়ের পেট থেকেই শিখে আসে।

খবরটা পড়ে শুনলাম নানি বিবিকে। তিনি মুখটা সিগ্যারেট মিক্‌সচারের পাউচের মতো কুঁচকে বললেন, 'নেংটির আবার বখেরা সেলাই!'

৮

ধনে প্রাণে মারা যায়

এক যাত্রায় পৃথক ফল! ইংরেজের আইন বড় মজার! আঠারো বছরের কমবয়সী কোনো মেয়ে যদি কোনো পুরুষের প্রেমে বা হ্যাপায় পড়ে গৃহ বা কুলত্যাগিনী হয়, তাহলে সে অকূলে পড়ে না আইনের প্যাঁচে। কিন্তু পুরুষের স্ত্রী ঘর বা শ্বশুরালয় বাস হয়ে যায়, বেশ কয়েক বছরের জন্য। 'অক্ষয়কুমার লীলাবতীর' লীলারঙ্গে লীলাময়ী যিনি, তিনি ঐ আঠারো বছরের কম বলে (নিজে অক্ষয়ের বাড়ি চলে গেছিলেন ইনি!) অবলীলাক্রমে আইন পিছলে বেরিয়ে এলেন, আর চোর দায়ে ধরা পড়ল বেচারা পুরুষ! আমরা বলি কি, এটা সাম্যবাদের যুগ! পুরুষ মেয়েতে সমান সুবিধা, সমান শাস্তি দেওয়া হোক! অর্থাৎ এইবার থেকে আইন হোক, আঠারো কম কোনো পুরুষ ঐরকম অপরাধ করলে তার কেস ডিসমিস হয়ে যাবে। কিন্তু মেয়ে যদি তার বেশি বয়সী হয়, তবে শাস্তি হবে! বেচারা পুরুষ! সাধে কি কবি লিখেছিলেন :

'রমণী পিরীতি করে তেল মাখে গায়,
ধরিতে কিনা ধরিতে পিছলিয়া যায়!'

কিংবা—

'তেল থাকে হাতে লেগে, রমণী পালায়।'

বেচারা অক্ষয়কে পাঁচ বছর ঠেলেছে! রায় শোনার পরই সে আফিম খেয়ে ফেলেছিল এক ড্যালা! কিন্তু মরবারও স্বাধীনতা নেই বেচারার! মেডিক্যাল কলেজে পেটে বোমা মেরে সে আফিম বের করেছে। অক্ষয় বোধ হয় এই ভেবেই আফিম খেয়েছিল যে,

'কাঁঠাল যা তুমি খেলে
আমার গলায় বাধল বিচি!'

ধনে প্রাণে মারা যাওয়া আর কাকে বলে?

হক সাহেবের হাসির গল্প

বাংলার প্রধানমন্ত্রী 'অনারেবল' হক সাহেব যে সুন্দর গল্প বলতে পারেন, তা আগে জানতাম না। তবে তাঁর কথায় কথায় চমৎকার ব্যঙ্গ, রসিকতা ও হাস্যরসের পরিচয় পেয়েছি। সকল শ্রোতাই হাসিতে ঘর পূর্ণ করে তা উপভোগ করেছেন। হক সাহেব সর্বদাই হাসি-মুখ। ভীষণ ক্রোধের পরক্ষণেই মুখে বালকের মতো সরল হাসির ফুল ফোটে।

দিন-দশেক আগে তাঁর দুটি গল্প শুনেছি। 'নবযুগের' পাঠক-পাঠিকাদের সেই গল্প দুটি উপহার দিচ্ছি। এর পরেও মাঝে মাঝে তাঁর হাসির গল্প উপহার দেবো।

তিনি বহু সভায় এবং বাড়িতে লোকজনের সামনে বহু হাসির গল্প সৃষ্টি করে বলেছেন। তাঁর শুধু হাসির গল্প বলা নয়, সভার অবস্থা বুঝে সুন্দর সুন্দর অন্য ধরনের গল্প বলারও বড় অসাধারণ ক্ষমতা আছে। হক সাহেবের সভার বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা এর সাক্ষ্য দেবেন। প্রথম গল্পটি বলছি শুনুন। গল্পটির নাম :

মরা কাউয়া

[মরা কাক]

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিনিধিরূপে ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য হক সাহেবকে আমন্ত্রণ করেন। হক সাহেব দিল্লি গিয়ে স্যার স্ট্যাফোর্ডের সাথে আলোচনা করার পর যখন বেরিয়ে আসেন, তখন দলে দলে খবরের কাগজের প্রতিনিধি ও লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'স্ট্যাফোর্ড সাহেবের সাথে আপনার কি কথা হলো?' হক সাহেব হেসে একটি হাসির গল্প বললেন। গল্পটির মর্ম এইরূপ : এক ছিলেন পণ্ডিত। তিনি অনেক দিন সংসার করে বৃদ্ধ বয়সে দিন-রাত বই-পত্তর নিয়ে নাক টিপে চোখ বুজে যোগ অভ্যাস করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণী দেখলেন, এই অবস্থায় আর কিছুদিন চললে সংসার চলবে না ; উপোস করে মরতেও হবে। ব্রাহ্মণী ধ্যানস্থ পণ্ডিতের সামনে শূন্য চালের হাঁড়ি ভেঙে বলতে লাগলেন—'এই চোখ বুজে টিকি উঁচিয়ে বসে থাকলে ছেলেমেয়েরা খাবে কি? বাড়িতে সাত দিনের চাল আছে। এই সাত দিনের মধ্যে চাল-ডালের টাকা না পেলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। এইসব ভণ্ডামি করে কি টাকা পাওয়া যায়?' ব্রাহ্মণ তেরিয়া হয়ে বললেন, 'কি? এসব ভণ্ডামি? তুমি আমার যোগের শক্তি দেখবে? আমি সাত দিনের মধ্যে সাত হাজার টাকা এনে দেবো।' ব্রাহ্মণী বললেন, 'ভীমরতি হয়েছে! চল্লিশ বছরে এক সাথে এক হাজার টাকা পারলেন না, সাত দিনে সাত হাজার টাকা দিবেন!' ব্রাহ্মণ বললেন, 'দেখে নিও।' পণ্ডিতের গোটা বিশেক লুকানো টাকা ছিল, তাই তার গাড়ু গামছা নিয়ে পণ্ডিত বেরিয়ে পড়লেন। শহরে গিয়ে দুএকজন ধূর্ত লোক যোগাড় করে বিজ্ঞাপন দিলেন, এক মহাযোগী ব্রাহ্মণ এসেছেন হিমালয় থেকে, তাঁর কাছে একটা মরা-মানুষের মাথার খুলি আছে, সেই মাথার খুলিকে যে যা জিজ্ঞাসা করে, সে তার সঠিক উত্তর দেয়। শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেল। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল বেশি কথা, কম কথা অনুসারে এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে দিতে হবে। সন্ধ্যা হতে না হতেই দলে দলে লোক এসে হাজির হল। ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে সব লোককে আসতে দিলেন না। একটা পর্দা টাঙিয়ে একটি একটি করে লোক আসতে দিলেন। প্রথমে যে লোকটি এল সে দশটি প্রশ্ন করতে চাইল। ব্রাহ্মণ পাঁচ টাকা চার্জ করলেন। ব্রাহ্মণের হাতে টাকা দিয়ে সে বলল, 'মরা মানুষের মাথার খুলি কই?' ব্রাহ্মণ একটা ঝুড়ি তুলে বললেন, 'এই।' সে রেগে উঠে বললে, 'এ যে মরা কাউওয়া, খুলি কই।' ব্রাহ্মণ কেঁদে ফেলে বললেন, 'খুলি-টুলি মিথ্যা, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ছেলেপিলে খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে—তুমি এ কথা

কাউকে বোলো না, বললে তোমাকে সবাই হাঁদা'বোকা আরো কত কি বলবে। মনে করো দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান করলে। তোমার মঙ্গল হবে বাবা, মঙ্গল হবে। সে লোকটি আর একবার মরা কাঁকের দিকে করুণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে বেরিয়েই হেসে ফেলল। লোকটি ছিল কায়স্থ। যত লোক তাকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'খুলি কি সত্যিই কথা কয়?' সে উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল, তখন ও নিশ্চয় কেল্লা ফতে করেছে। ভিড়ের লোক ঠেলাঠেলি করে কে আগে যাবে, তার চেষ্টা করতে লাগল। যে যায় ব্রাহ্মণ তাকে ঐ এক কথাই বলে—আগে টাকা নিয়ে। কেউ কথা বলল না, পাছে অন্য লোকে তাকে বোকা বলে। এক রাত্রেই ব্রাহ্মণের সাত হাজার টাকা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়াল। ব্রাহ্মণীকে ডেকে সগর্বে বলল, 'এই নে সাত হাজার টাকা। আর আমায় কিছু বলিসনে। আমি লঙ্কা বিজয় করে এসেছি।' ব্রাহ্মণী বদন-ব্যাদান করে এক হাত জিভ বের করে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

দ্বিতীয় গল্প

পাড়াগাঁয়ের গরিব মুসলমানদের মধ্যে একজন মোড়ল ছিলেন। তাঁকে সকলে ফকিরজি বলে ডাকত। তিনি দিনরাত আল্লা নাম জিকির করতেন। তাঁর গায়ে সর্বদা থাকত একটি চাদর। সেই চাদরে লেখা ছিল কোরান শরিফের অনেকগুলি বিখ্যাত সুরা (শ্লোক)। সেটিকে তিনি সযত্নে রক্ষা করতেন। সেই চাদর গায়ে দিয়ে গ্রামের লোকদের অনেক মাজেজা (বিভূতি) দেখাতেন, রোগ ভাল করতেন, তাদের মাঠে বেশি ফলন ফলাতেন ইত্যাদি। আর এক গ্রামের মোড়ল তাই দেখে মনে করল—ঐ মোড়লের যা কিছু শক্তি, ঐ চাদরের গুণে। ওকে যে গ্রামের—এবং পাশের অনেক গ্রামের লোকেরা শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) করে খাওয়ায় তার কারণ ঐ চাদরের শক্তি। ঐ চাদর কেড়ে নিয়ে গায়ে দিলেই আমাকেও সকলে সম্মান দেবে, শ্রদ্ধা করবে, পির বলে মানবে। এই ভেবে একদিন সে হাত জোড় করে সেই ফকিরকে নিমন্ত্রণ করে এল রাত্রে খাওয়ার জন্য। সন্ধ্যায় সেই ফকির এসে হাজির হলেন অন্য গ্রামের মোড়লের বাড়িতে। তখন সে তার দলবল নিয়ে রাম দা দেখিয়ে বলল, 'তুমি যদি তোমার গাঁয়ের ঐ চাদর আমাকে না দাও, তা হলে তোমাকে কোতল করব।' বেচারা ফকির ওর রক্ত-চক্ষু আর রামদা দেখে গায়ের চাদর দিয়ে পালিয়ে এল।

ও-গাঁয়ের মোড়ল চাদর গায়ে গিয়ে সগর্বে পাড়া বেড়িয়ে এল। আড়-চোখে দেখতে লাগল, কেউ চেয়ে দেখে কিনা। কেউ এসে সালাম করে কিনা। কেউ জিজ্ঞাসাও করল না, 'মোড়ল! খবর সব ভাল তো?' মোড়ল হতাশ হলো না। মনে করল, দু-চারদিন গায়ে দিতে দিতে এর শক্তি বেরিয়ে পড়বে। দিন পনেরো ক্রমে ক্রমে একমাস গায়ে দিয়েও কোনো শক্তি পেয়েছে বলে মনে হল না। গ্রামের লোক হাসে আর বলে, মোড়লের মাথা খারাপ হয়েছে।

এদিকে ফকির চাদর হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। চাদরের শোকে কাঁদতে লাগলেন। এই চাদর তিনি মক্কা-মদিনাফেরত এক হাজির কাছে পেয়েছিলেন। একদিন ফকিরজি আর থাকতে না পেরে নদীর ধারে সারা রাত্রি জেগে জিকির করেন আর কাঁদেন ! ভোরের সময় একজন ফেরেশতা (দেবদূত) এসে বলল, 'তোমার কোনো ভয় নাই, তোমার চাদর তুমি ফিরে পাবে। ও গাঁয়ের মোড়ল চাদর গায়ে দিয়ে কোনো শক্তি পায়নি। সে তো আল্লাকে ডাকে না। ধৈর্য ধরো, আর কিছু দিন গায়ে দিয়ে ও তোমার চাদর আবার তোমায় ফিরিয়ে দেবে।'

ফকির আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

এক সাহেব বালকের মতো হাসি হেসে বললেন, 'ঐ ফকিরের চাদরের মতো মুসলিম লীগ ওরা কেড়ে নিয়েছে। প্রথম প্রথম কষ্ট হয়েছিল, এখন আমি জানতে পেরেছি, আমার চাদর অর্থাৎ আমার মুসলিম লীগ আবার আমার কাছে ফিরে আসবে।' সকলে সোল্লাসে হেসে উঠলেন।

নবযুগ,
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৯